তিন প্রহর

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

তৃতীয় মুদ্রণ—আশ্বিন, ১৩৭৩

প্রথম প্রকাশ—ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২

প্রকাশক :

ময়ূখ বসু

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রক :

বিভূতিভূষণ রায়

বিদ্যাসাগর প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১৩৫।এ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট

কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী :

শচীন বিশ্বাস

চার টাকা

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

লেখকের অন্যান্য বই :

কৃষ্ণচূড়া
উপনিবেশ (তিন পর্ব)
শিলালিপি
লাল মাটি
স্বর্ণসীতা
একতলা
বৈতালিক
শ্রেষ্ঠগল্প
স্ব-নির্বাচিত গল্প
সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী
সঞ্চারিণী
নীল-দিগন্ত
বিদূষক
ভাটিয়ালী
শুভক্ষণ
সাপের মাথার মণি
রূপমতী
পদসঞ্চার
সাহিত্য ও সাহিত্যিক
সাহিত্যে ছোটগল্প
বাংলা গল্পবিচিত্রা
রামমোহন (নাটক)
ভাড়াটে চাই (নাটক)
বারো ভূতে (নাটক)

১৩৬৮ সালের 'শারদীয়া বিংশশতাব্দী'তে উপন্যাসটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থকারে মুদ্রণের সময় কিছু কিছু সংযোজন করা হয়েছে।

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা

ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২

॥ ১ ॥

কাল সকালে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

এই বাড়ি—যেখানে আমি পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেছিলুম, যেখানে জীবনের এই চুয়ান্নটা বছর আমার কেটেছে। ইংরেজরা বলে রূপোর চামচে, সোনার চামচে মুখে নিয়েই জন্মেছিলুম আমি, অথবা সোনার ঝিনুক। তারপর আমার চোখের সামনে এই চুয়ান্ন বছর ধরে কী ভাবেই যে সব শেষ হয়ে গেল! হাজার হাজার আতসবাজি জ্বলল, মুঠো মুঠো করে আলোর অহমিকা ছড়িয়ে দিলে আকাশের তারার দিকে—শেষ পর্যন্ত ভাদ্র মাসের অমাবস্যার মেঘে ঢাকা রাতের মতো নিথর কালো অন্ধকারে চারদিক ডুবে গেল।

সামনের জানালা দিয়ে সাত পুরুষের ভিটেটা দেখতে পাচ্ছি। সবটা দেখা যায় না—এতটুকু এই জানালা দিয়ে দুর্গের মতো বাড়িটার কতটুকুই বা নজরে আসে? তবু যতটুকু দেখতে পাচ্ছি—তাও কী বিরাট—কী ভয়ঙ্কর! এমনি একটা দানব পুরীতে এই চুয়ান্ন বছর ধরে বাস করছি, এই সত্যটাকে যেন আজ আমি প্রথম আবিষ্কার করলুম। যেমন সমুদ্রের মাছ ডাঙায় তুলে আনলে সে সাগরের বিরাটত্বকে অনুভব করতে পারে।

জানালার বাইরে সন্ধ্যা নেমেছে। পুরনো ঘরবাড়ির এখানে-ওখানে তক্ষক ডাকছে, প্যাঁচা চিৎকার তুলেছে—চণ্ডীমণ্ডপে পায়রার পাখা ঝটপটানির আওয়াজ পাচ্ছি। ঠাকুরমার মুখে শুনেছিলুম, বাড়ির লক্ষ্মী ছেড়ে গেলে পায়রারাও আর থাকে না—

অন্য কোনো সুখের ঘরের সন্ধানে বিদায় নিয়ে যায়। কিন্তু ওরা কেন এখনো যায়নি? কিসের আশায় আজো এই বাড়ির আনাচ-কানাচ আঁকড়ে পড়ে আছে?

ওরা থাকুক, ওদের জন্যে আমার ভাবনা নেই। আর নিজের জন্যেই বা ভাববার কী আছে? কাল সকালের ট্রেনেই তো বেরিয়ে পড়ব। প্রথমে যাব হরিদ্বার। সেখান থেকে অমৃতসর। তারপর—

তার পরের খবর আমি আর জানি না। কোনো হোটেলে—কোনো ওয়েটিং-রুমে—কোনো সরাইখানায়—একদিন পৃথিবীর সব বাকী হিসেবটুকু চুকিয়ে দেব। 'আন-ল্যামেণ্টেড্ 'আন-সাং।' কে আমার জন্যে বিলাপ করবে? এমন কোন্ মহৎ কীর্তিটা জীবনে করেছি—যার জন্যে আমার মৃত্যুকে আশ্রয় করে কোনো কবি গান বাঁধতে যাবে? ছবি আঁকবে কোনো শিল্পী?

হ্যাঁ—কিছু করেছি বইকি! কীর্তি না থাক, অকীর্তির খাতায় সঞ্চয় আমি রেখেছি নিশ্চয়ই। এই যে হাজার হাজার আতসবাজি জ্বলে সাত পুরুষের, অথবা তারো বেশি—যা কিছু জমেছিল, বারুদের কণার মতো পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল, তাতে আমারও তো অনেকখানি কৃতিত্ব ছিল। সেই গৌরবের ইতিহাস তো কেউ লিখবে না। জানি না নরক আছে কিনা; যদি থাকে, তাহলে সেইখানে বসেই শয়তান মড়ার খুলির প্রদীপ জ্বেলে একটা কালো খাতায় রক্তের অক্ষর দিয়ে তা লিখছে; সে-ই আমার হাতে পাকা হিসেবের ছাড়পত্রটি ধরিয়ে দিয়ে কোনো রৌরব-কুম্ভীপাকের দরজা খুলে দেবে।

এই বিশাল শূন্য বাড়িটার নানা মহলগুলো অন্ধকারে আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। যেন সারি সারি পোড়া আতসবাজির খোলস। কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের সেই কালো কালো পুরনো কবরগুলোকে যেন কেউ পাঁচ-দশগুণ বাড়িয়ে এখানে এনে সাজিয়ে

দিয়েছে। মাঝরাতে ওদের তলায় আমার পিতৃপুরুষদের হাড়গুলো মড়মড় করে নড়ে উঠবে—বাতাসের শব্দে গলা মিলিয়ে তারা আমাকে অভিসম্পাত দেবে। আজ চুয়ান্ন বছর ধরেই হয়তো দিচ্ছে; কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না।

আমি অনুতপ্ত?

না—বিন্দুমাত্র নয়। কেন অনুতাপ করব? আমিও এই বংশের—এই জমিদার বাড়িরই ছেলে। কী করে এত বড় সম্পত্তি প্রথম আমাদের হাতে এসেছিল, সে কাহিনী কি আমিও শুনিনি?

আমরা ব্রাহ্মণ। যজন-যাজন-অধ্যাপনা আমাদের পেশা। জমিদার হওয়া আমাদের ধারা নয়, জমিদার আমরা ছিলুমও না। যেন আলাদীনের প্রদীপের ঘষায় একরাতেই আমাদের হাতে এই বিশাল সম্পত্তি চলে এসেছিল। সে এক অপূর্ব ইতিহাস। অপূর্ব বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস!

সাত পুরুষ—দশ পুরুষ—চৌদ্দ পুরুষ? জানি না। অত হিসেব আমার আসে না। সেই যত পুরুষ আগেই হোক—আমাদের কীর্তিমান সেই আদি মানুষটি ছিলেন পেশায় গুরু। অনেক বড়ো বড়ো শিষ্য ছিল তাঁর; তিনি নাকি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন—মন্ত্র বলে সুন্দরী ডাকিনী উড়িয়ে এনে তন্ত্রসাধনায় বসতেন।

কাজেই জমাট পশার ছিল তাঁর।

তখন এই গ্রামের যিনি জমিদার ছিলেন, তিনি রাজপুত ক্ষত্রিয়; মোগল আমলে বারো ভুঁইয়া দমন করে তাঁর কে যেন এখানে জমি জায়গীর বকশিস পেয়েছিলেন। গুরু-ব্রাহ্মণে ছিল তাঁর অচল ভক্তি আর অটুট বিশ্বাস। আমাদের সেই পূর্বপুরুষটির চরণপ্রান্তে দীক্ষা নিয়ে ধন্য হয়েছিলেন তিনি।

তাঁরা স্বামী-স্ত্রী ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁদের গুরুদেব মন্ত্রবলে ডাকিনী-যোগিনী আহ্বান করতে পারলেও একটি সন্তান কিন্তু

শিষ্যদের আনিয়ে দিতে পারেননি। সেই মনঃক্ষোভের তাড়নাতেই হয়তো বুড়ো বয়সে তাঁরা তীর্থ ভ্রমণে বেরুবেন ঠিক করলেন। কাশী গয়া থেকে শুরু করে নেপালের পশুপতিনাথ আর দ্বারকানাথ পর্যন্ত দর্শন করে আসবেন।

কিন্তু এত বড় জমিদারী কাকে দিয়ে যাবেন? কে এর দেখাশোনা করবে?

তখন গুরুদেবকে স্মরণ করলেন। গুরু পিতা, গুরু ব্রহ্ম, গুরু ধর্ম। সংসারে গুরুর চাইতে বড়ো আর কে আছে?

"—প্রভু, আমরা যতদিন তীর্থভ্রমণে থাকব, ততদিন আমাদের এই জমিদারীর ভার আপনাকে নিতে হবে।"

গুরুদেব আপত্তি করলেন। জানালেন, তিনি সন্ন্যাসী (যদিও গৃহী-সন্ন্যাসী এবং পুত্র-কন্যায় মিলিয়ে গুটি পাঁচেক সন্তান তাঁর ছিল); এ সব বিষয়-বৈভবের দায়িত্ব তিনি নিতে পারেন না।

কিন্তু শিষ্য ছাড়েন না। অগত্যা গুরু বললেন, আচ্ছা, নিতান্ত যখন ধরাধরি করছ—তখন তোমার অনুরোধ আমার রাখতেই হবে। সবই তারা ব্রহ্মময়ীর ইচ্ছে। আমি তো নিমিত্ত মাত্র।

শিষ্য-শিষ্যাণী বেরিয়ে পড়লেন তীর্থভ্রমণে। একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে।

চার বছর পরে যখন ফিরলেন, তখন দেউড়ীর দারোয়ান আর তাঁদের ভেতরে ঢুকতে দিলে না।

গুরুর কাজই হল শিষ্যের পাপ হরণ করা, আমাদের সেই পূর্ব-পুরুষও নিজের কর্তব্য ভোলেননি। শিষ্যের বিষয়-বাসনার পাপ তিনি মোচন করে দিয়েছিলেন। কখন নিজে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারে, কী করে ভুলিয়েছিলেন দেওয়ানকে—সে যোগশক্তির কথা তিনিই জানেন। কিন্তু পুরোনো জমিদার—বৃদ্ধ অসহায় মানুষটি, তীর্থ থেকে ফিরে এসে দেখলেন এই

জমিদারীর তিনি আর কেউ নন। গুরুদেব সব নিজের নামে পত্তনি করে নিয়েছেন।

নবাব সরকারে ছুটোছুটি করে নিজের সম্পত্তি ফিরে পাওয়া জমিদারের পক্ষে সম্ভব ছিল কিনা জানি না, কিন্তু প্রবৃত্তি ছিল না। রাজপুতের দুই চোখে আগুন জ্বলে উঠল, কিন্তু একবারের জন্যেই। তারপর গৃহ-দেবতার মন্দিরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে যে নৌকোয় এসেছিলেন সেই নৌকোতেই আবার ভেসে চলে গেলেন। হয়তো গুরুর চরণে সব নিবেদন করে কৃতার্থ হয়েই চলে গেলেন! কিন্তু কোথায় গেলেন—কেউ তার খবর রাখে না।

তারপর থেকেই আমরা জমিদার। ডাকিনী-যোগিনী মন্ত্রবলে আনতে পারি আর না-ই পারি, বাঈজী আনিয়েছি ; কারণ-বারির পাত্র না জোটে, মদের বোতলের অভাব ঘটেনি। আমরাও প্রেতসিদ্ধি লাভ করেছিলুম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রেত আমাদের ঘাড় মটকে রক্ত শুষে খেয়েছে—প্রভেদ বলতে এই।

অন্যায় করেছি? কিছুমাত্রও নয়। পাপ দিয়ে যার পত্তনি হয়েছিল, পাপের ঘা দিয়েই তার শেকড়সুদ্ধ উপড়ে দিয়েছি। আমিই সেই কৃতী বংশধর—যে পূর্বপুরুষের কৃতঘ্নতার চরম প্রায়শ্চিত্ত করে গেল।

আমি জানি—রাত বাড়লে কী হয়। তখন এই শূন্য বাড়িটায় সাতপুরুষ, দশ পুরুষ, চৌদ্দ পুরুষের প্রেতাত্মারা এসে হানা দেয় দলে দলে। ভাঙ্গা ইট-কাঠের স্তূপের ওপর দিয়ে চলে বেড়ায় তারা, তাদের কঙ্কাল শরীরের হাড়গুলো নিরুপায় ক্রোধে মড়মড় করে আওয়াজ তোলে, তাদের সাদা করোটির চক্ষুহীন কোটর থেকে আগুনের আলোর মতো অভিশাপ ঠিকরে পড়ে আমার দিকে—তাদের দাঁতে দাঁতে কড়কড় করে আওয়াজ ওঠে। তখন এই বাড়িতে বাতাসের নিঃশ্বাস পড়ে না, রাতচরা প্যাঁচাগুলো হঠাৎ

কোটরে এসে মুখ লুকোয়, আতঙ্কে থেমে যায় তক্ষকদের ডাক। আর আমার ঘরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে ক্রমাগত যেন অভিশাপ দিতে থাকে নিপাত যাও—নিপাত যাও—নিপাত যাও—

ব্রহ্মশাপ! কতদিন রাতে যেন ঘুমের ঘোরে সেই অভিশাপ শুনতে শুনতে আমি হেসে উঠেছি। বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে যে বংশের ইতিহাস আরম্ভ—তাদের অভিশাপ ফলে না; নিজের পেশা ছেড়ে দিয়ে যে ব্রাহ্মণ জমিদারী করে, তার ব্রহ্মতেজ মিথ্যে হয়ে যায়। আমি ওতে ভয় পাই না।

তবু ভয় পাওয়াতে চেষ্টা করেছে আমাকে। আমি মানি না—আমি বিশ্বাস করি না; তবু দেখেছি নিজের চোখেই। অন্যের মুখে শোনা গল্প এ নয়।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত মদ খেয়েছিলুম। তারপর টেবিলটার ওপরে মাথা রেখে কখন ঝিমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। এক সময় মুখে মাথায় জলের ঝাপটা লাগতে আমি জেগে উঠলুম। দেখলুম ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে—খরধারায় বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। আর ঝড়ের বাতাসে জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট এসে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিচ্ছে আমার।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালুম। বন্ধ করতে গেলুম জানালাটা।

আর ঠিক সেই সময় দেখতে পেলুম।

সামনের উঠোনটায় কে দাঁড়িয়ে। হয়ত আমাদের সেই প্রথম পুরুষ—সেই গুরুদেবই হবেন স্বয়ং। একটা প্রখর বিদ্যুতের চমকে দেখতে পেলুম, সাধারণ-মানুষের চাইতে অন্তত চারগুণ সে উঁচু, মাথার দুপাশ দিয়ে রুক্ষ চুলের গোছা সাপের মতো কিলবিল করছে, সাদা দাড়ি গোঁফগুলো রূপোর মত জ্বলছে, কপালে কঠিন ভ্রূকুটি এঁকে রুদ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমার দিকেই। চোখ নয়—টকটকে লাল রঙের দুটো ভাঁটা ঘুরছে তার মোটা মোটা ভুরুর নীচে।

এত বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, তবু এক ফোঁটা জল পড়েনি তার গায়ে ; মাটিতে দাঁড়িয়ে, তবু যেন হাওয়ায় ভাসছে তার শরীর। নিজের চারদিকে মৃত্যুর বিচ্ছিন্নতা নিয়ে সে জগৎ থেকে আলাদা হয়ে আছে। পৃথিবীর কেউ সে নয়, তবু পৃথিবীর বিষয় সম্পত্তির টানটা এখনো কাটাতে পারেনি—আশ্চর্য!

না—আমি ভয় পাইনি। তৎক্ষণাৎ বজ্র ডেকে উঠল, তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমি অট্টহাসি হাসলুম। তারপর দেখলুম—সে নেই। সেই অগ্নিমূর্তি পিতৃপুরুষ আমার হাসির আঘাত সইতে পারেনি, তার ক্লীব ক্রোধ নিয়ে ঝড়ের হাওয়ায় হাহাকার করতে করতে নিজের মৃত্যুজগতে ফিরে চলে গেছে।

চোখের ভুল ? নেশার ঘোরে দেখেছিলুম ? হয়তো তাই হবে, হয়তো তা নয়। এই বাড়িতে একা রাত কাটিয়ে অনেক রকম অভিজ্ঞতাই তো হয়েছে আমার। কতদিন তো মনে হয়েছে মশারির বাইরে কারা যেন ফিসফিস করে কথা কইছে, কে এসে বরফের চাইতেও ঠাণ্ডা একখানা হাত রেখেছে আমার কপালে, দরজার বাইরে একটানা গোঙানির আওয়াজ তুলে কারা যেন সারারাত ধরে কেঁদেছে। ঠিক জানালার পাশে বিকট গলায় বেড়ালের ঝগড়া শুনেছি, কিন্তু জানালা খুলে—টর্চ জ্বেলে দেখেছি—বাইরে, বেড়াল দূরে থাক, একটা নেংটি ইঁদুরেরও চিহ্ন নেই।

আজ বছর তিনেক ধরেই এই উৎপাতগুলো বেড়েছে।

ভৌতিক ব্যাপার ? পিতৃপুরুষদের জানান দেওয়া ? অথবা দেড়শো দুশো বছর ধরে যত অপঘাত ঘটেছে এই বাড়িতে এ সব তারই স্মৃতিবহ ?

ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিলুম। সে বলে, ও-সব কিছু নয়। সিরোসিসের অ্যাড্‌ভান্সড্‌ স্টেজে মানুষ এ-সব নানারকম ইলিউশন্‌ দেখে। অ্যাল্‌কোলিজম্‌ থেকে কখনো কখনো এই সব নাইট্‌মেয়ার

আসে। একটু চেষ্টা করে মনে জোর নিয়ে আসুন। মদ ছাড়ুন, এসবও আপনাকে ছেড়ে যাবে। হয়তো কয়েক বছর বেশিও বাঁচতে পারবেন।

কে চায় বাঁচতে? ডাক্তারকে বলেছিলুম, তুমি একটা ইডিয়ট।

হয়তো রোগের প্রভাবেই এ সব দেখতে পাই; অসুস্থতার সঙ্গে *নেশার ঘোর চোখের সামনে এগুলোকে সৃষ্টি করে—যা কিছু শুনতে পাই, সবই অলীক। কিংবা হয়তো সবই সত্য। এ আমার তৃতীয় শ্রুতি। আমি যদি খুবই সহজ আর স্বাভাবিক মানুষ হতুম—তা হলে সবাই যা দেখে তার বেশি দ্রষ্টব্য* আমার থাকত না—সব মানুষে যা শোনে তার বেশি কিছু শুনতে পেতুম না। কলেজে পড়বার সময় কবি কোল্‌রিজের কথা শুনেছিলুম। তাঁর আফিঙের নেশা যেমন করে তাঁকে প্রত্যক্ষের সীমার বাইরে নিয়ে যেত, তেমনি করেই আমার ব্যাধি—আমার নেশা চেনা-পৃথিবী থেকে আমায় মুক্তি দেয়—আমার চোখের সামনে থেকে ইহলোক-পরলোকের সমস্ত বাধা সরে যায়।

কিন্তু চুলোয় যাক পূর্বপুরুষের কথা। জানি, আজ রাতেও তারা আসবে। শেষবারের মত অভিশাপ দিতে আসবে আমাকে। আসুক, আমি গ্রাহ্যও করি না। কাল সকালেই এই বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাব। আদিপুরুষদের পাপের যত ঋণ জমেছিল, সব একেবারে মিটিয়ে দিয়ে বিদায় নেব।

কিন্তু পাপ? আমি কি সত্যিই পাপ করেছি? আমি কি একেবারে ব্যর্থ—একান্ত মিথ্যা? আজ এই মুহূর্তে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি, তার সবটাই কি আমার প্রাপ্য?

পিতৃপুরুষের কথা জানি না, কিন্তু একটা কথা আজকে বুঝতে পারছি। প্রত্যেকটি মানুষই এই সংসারে অভিশাপ নিয়ে জন্মায়। কিসের অভিশাপ? যা সে হতে চায় না—তাই তাকে হতে হয়;

যা সে হতে চায়—তা কোনোদিন হতে পারে না। যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই—এমনি কী একটা কবিতা আছে রবি ঠাকুরের। লাইনগুলো আজ আর আমার মনে পড়ছে না,কিন্তু বহুবার ভেবেছি, হয়তো আমার কথাই ওই কবিতায় অমন ভাবে লেখা হয়েছিল।

আমার কথা? কিংবা সকলের কথা—সব মানুষের কথা?

কার একটা ইংরেজী গল্প যেন পড়েছিলুম অনেকদিন আগে। *জেল থেকে বেরিয়ে এসে একটা দাগী চোর অনুতপ্ত মনে ভেবেছিল এইবারে সে ভালো হবে—চুরি-চামারি আর করবে না, একেবারে খাঁটি ভদ্রলোকের মতো দিন কাটাবে। কিন্তু কিছুতেই সে ভালো হতে পারল না। যে-পথে সে যেতে চায়নি, সেই চুরির পথই আবার তাকে টেনে নিয়ে গেল।*

শুধু সেই চোরটাই নয়! আমরা সবাই যা হতে চাই তা হতে পারি না। যা হতে চাই না—তাই হতে হয়। তখন নিজের ভেতরে যে বিরোধটা সৃষ্টি হয়—তাতেই আমরা দিনের পর দিন ক্ষতবিক্ষত হই, আত্মহত্যার পথ ধরি। পৃথিবীতে যদি কোনো পাপ থাকে, তা হলে তা এই। একমাত্র এই।

আবার উষারানীকে মনে পড়ছে।

সেদিন গ্রীনরুমে কী কান্নাই কেঁদেছিল সে। কী অসহ্য বুকফাটা তার কান্না!

—জানেন, স্কুলে যখন ভর্তি হয়েছিলুম, তখন সব পরীক্ষায় আমি ফার্স্ট হতুম। কিন্তু চৌদ্দ বছরে পা দিতে আমার মা—উষারানী তারপর কেবল বলেছিল, ডাইনি—ডাইনি।

কিন্তু উষারানী এখন নয়। তার কথা পরে আমায় ভাবতে হবে—অনেকবার ভাবতে হবে।

॥ ২ ॥

আজ দিন সাতেক হল, মদ ছেড়ে দিয়েছি। জানি অনেক দেরী হয়ে গেছে—এখন ছাড়া না ছাড়া দুই-ই সমান। তবু ভেবেছি, যাওয়ার আগে এই বাড়ি থেকে সাদা চোখ নিয়েই বেরিয়ে যাব। একবার তলিয়ে দেখে নিয়ে যাব—কী করেছি, কী করতে পারিনি। লোকে বলে, নিজের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখা যায় না। কিন্তু আমি জানি, ওটা মিথ্যে। একমাত্র নিজের মনের কাছেই ধরা পড়ে, আমি কতখানি খাঁটি, কতটাই বা ফাঁকি, জীবনে আমার কতখানি সত্য আর কতখানিই বা অভিনয়।

অভিনয়।

এই কথাটা আমার আসল চিন্তার মধ্যে আমাকে ফিরিয়ে আনল। এতক্ষণ ধরে এইখানটাতেই আসতে চেষ্টা করছিলুম আমি। আমার হওয়া না-হওয়া পারা না-পারার সেই চাবি-কাঠিটি লুকিয়ে আছে এরই ভেতরে।

আমার জানালা দিয়ে মোমবাতির একটা আলোর রেখা অন্ধকার উঠোনটাতে গিয়ে পড়েছে। একটা নাটকের প্রথম দৃশ্য মনে আসছে; মাঝরাতে ঘরের ভেতরে ঢুকেছে খুনী, হাতে ধারালো ছোরা নিয়ে এগিয়ে চলেছে তার শিকারের দিকে। একটা আলোর রেখা তাকে অনুসরণ করছে। সেই খুনীর ভূমিকায় আমি অভিনয় করছিলুম। তারপর আলোর নির্দেশ গিয়ে পড়ল ঘুমন্ত মেয়েটির মুখে—কি যেন সুখের স্বপ্নে এক টুকরো হাসির রেখা ফুলের পাপড়ির মতো ঠোঁটে ফুটে আছে তার। চমকে খুনীর হাত থেকে ছোরাটা খসে পড়ল, ভয়ে বিছানার

ওপর উঠে বসল মেয়েটি। তারপর চাপা গলায় চিৎকার করে উঠল : তুমি?

পার্টটা করছিল উষারাণী। আর চরিত্রটার নাম কি ছিল? সুমিত্রা না সুমিতা? সুমিত্রাই হবে খুব সম্ভব।

কিন্তু জীবনের প্রথম দৃশ্যটা যখন আরম্ভ হয়েছিল তখন খুন কোথাও ছিল না।

বাড়িতে যাত্রা হচ্ছিল। এখনো মনে আছে : লক্ষ্মণ বর্জন।

আমার তখন বয়েস কত আর? এগারো? বারো? সামনের সারিতে বসে যাত্রা শুনছিলুম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, যখন খেয়াল হল, তখন ঝাড়-লণ্ঠন নিবু-নিবু, ভোরের আলো ফুটছে। আর রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাহাকার করছে :

প্রিয়তম, অনুজ আমার
যাও চলি দেবধাম পথে—
তোমারে ছাড়িয়া
আমিও বহিতে নারি দেহ আপনার
মিটাইব সব জ্বালা সরযূর জলে—

আজ বেয়াল্লিশ বছর পরেও এই লাইনগুলো আমি ভুলিনি। সেই দারুণ শোক, রামের সেই হাহাকার আজও আমার বুকের মাঝখানে বিঁধে আছে। অনেক অভিনয় দেখেছি, সারা জীবন অভিনয়ের মধ্যে দিয়েই তো কেটে গেল, কিন্তু সেই দৃশ্যটা মনের মধ্যে সব চাইতে স্থির আর স্থায়ী হয়ে রয়েছে। সেই হঠাৎ ঘুম ভাঙা চোখ, সেই ভোরের আলো, নিবু-নিবু ঝাড়-লণ্ঠনের আশ্চর্য মায়াটা আর সেই অভিনয়—সব মিলে আমার জীবনে তা সবচেয়ে অপরূপ অভিজ্ঞতা।

সেই আমাকে অভিনয়ের নেশায় ধরল।

বাড়ি তখন জমজমাট। তিন শরিকের কেউ তখন পর্যন্ত দেশ-ছাড়া হয়নি। নিঃসন্তান জ্যাঠামশাই মারা গেছেন—বুড়ো জ্যাঠাইমা তখনো বেঁচে; খুড়তুতো ভাইয়েরা কিলবিল করছে চারদিকে। তাদের জুটিয়ে নিয়ে আমিও বাড়িতে যাত্রার দল খুলে ফেললুম।

দুপুর বেলা যাত্রা হত বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে। আমরাই অভিনেতা আমরাই দর্শক। আর আমি অধিকারী। রামের পার্টটাও আমি নিয়েছিলুম।

বাড়ির অন্য ছেলেরা আমাকে মেনে নিয়েছিল, কিন্তু আপত্তি করত খুড়তুতো ভাই বিনু। বশিষ্ঠের পার্ট দিয়েছিলুম তাকে। বিশেষ কিছু তাকে করতে হত না, কেবল বলতে হত, 'সুখে থাকো বৎসগণ, ধর্মপথে থাক মতি, হউক কল্যাণ।'

তা-ও ভাল করে বলতে পারত না—আমাদের মধ্যে সে-ই ছিল সব চাইতে খারাপ অভিনেতা।

তবু বিনুই প্রতিবাদ করত সবচেয়ে বেশি।

—বা রে তুমি একাই কেন রামের পার্ট করবে? আমিও রাম হবো।

বলতুম, যা-যা। বেশি বকবক করবি তো তোকে কুম্ভকর্ণের পার্টটা দিয়ে দেব। কিংবা তাড়কা রাক্ষুসির।

লক্ষ্মণ বর্জনে কুম্ভকর্ণ কিংবা তাড়কা কোথাও ছিল না, কিন্তু বিনুকে অপমান করবার পক্ষে ওই ছিল যথেষ্ট। কান লাল হয়ে উঠত ওর, রেগে গোঁ হয়ে থাকত কিছুক্ষণ, তারপর বলত, ছাইয়ের যাত্রা তোদের—পচা যাত্রা। তোদের যাত্রায় আমি আর পার্ট করবো না।

কিন্তু আবার আসত পরের দিন। লোভ সামলাতে পারত না।

অবশ্য জীবনের শেষ অভিনয়ে বিনুই জিতে নিয়েছে। যখন দিন

এল, তখন দেখেছিলুম—ওই হল সত্যিকারের অভিনেতা। আমার সাধ্য কি—পেরে উঠব ওর সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত ক্ল্যাপ তো বিমুই নিলে আর আমি মৃত সৈনিকের ভূমিকায় কোথায় তলিয়ে গেলুম।

কিন্তু আগের কথাতেই ফিরে আসি।

সেদিন বোধহয় মুখ বদলাবার জন্যে 'লক্ষ্য বলি' যাত্রা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাজা সুরথের ভূমিকায় নেমে আমি খুব লম্ফ-ঝম্প করেছিলুম আর বিমু একটু দূরে বসে মাথা নাড়ছিল সমানে ভাবটা : হচ্ছে না—কিছুই হচ্ছে না তোর।

কাকা তখন বাইরের কাছারীতে বেরুচ্ছিলেন। রোজই যান, আমাদের ছেলেমানুষী যাত্রার দিকে তাঁর চোখও পড়ে না। কী মনে করে সেদিন দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, বাঃ—বেশ হচ্ছে তো। এর পরে দেখছি হারাণ অধিকারীকে আর ডাকতে হবে না, তোরাই মাতিয়ে দিবি।

আমরা লজ্জা পেলুম। তখুনি অভিনয় থেমে গেল, পালাবার জন্যে পা বাড়ালুম সবাই।

কাকা আমাকে ডাকলেন।

—নিমু, এদিকে আয়।

একটা চড়-টড় খাব কিনা বুঝতে পারলুম না, চোরের মতো এগিয়ে গেলুম কাকার কাছে।

কাকা আমাকে কাছে টেনে নিলেন। পিঠে আস্তে আস্তে গোটা দুই থাবড়া দিয়ে বললেন, তোর তো থিয়েটারের বেশ ন্যাক্ আছে দেখছি। এবার তোকে কাজে লাগাতে হবে।

আমার ভাগ্যের আকাশে—যদিও ভাগ্য বলে কিছু আমি মানি না—শনিগ্রহ দেখা দিল এই প্রথম।

এইখানে বলে রাখি, পূজোর সময় যাত্রা ছাড়াও বাড়িতে থিয়েটারও হত কখনো-কখনো বিশেষ করে লক্ষ্মীপূজোর রাত্রে।

বড়রা অভিনয় করতেন, আমলা কর্মচারী ছাড়া গ্রামেরও কেউ কেউ তাতে পার্ট করতেন। কাকাই ছিলেন তার পাণ্ডা।

সে অভিনয় আমরা দেখতুম, কিন্তু কখনো খুব ভালো লাগত না। বাবা তো একবার মন্ত্রীর ভূমিকায় চশমা পরেই চলে এসেছিলেন। নায়েবমশায়ের দাড়ি স্টেজেই খুলে পড়ে গিয়েছিল। 'হাঃ—হাঃ—হাঃ—সামন্দেশ' বলতে বলতে কাকা নিজেই চটাস্ করে হাঁটুর ওপরে একটা মশা মেরে দিয়েছিলেন। সে সব অভিনয়ে অভিনয়টা বড় কথা ছিল না—যেমন করে হোক বাড়ির লোককে খানিকটা আনন্দ দিতে পারলেই হল। সে আনন্দ সবাই-ই পেতেন—তা নায়েবমশায়ের দাড়ি খুলে যাওয়াতেই হোক কিংবা কাকার মশা মারাতেই হোক।

পরদিন তার বিস্তারিত টীকা-ভাষ্য চলত অন্দর মহলে।

—আহা ঠাকুরপো, কী ভুবন-মোহিনী রাজকন্যাই সাজিয়ে ছিলে! মাগো, ভাঙা ভাঙা চোয়াল—কাকের মতো গলার আওয়াজ, ওরই রূপে নাকি ত্রিভুবন পাগল!

—বলি দুগ্‌গো ঠাকরুণকে কাপড়টা পরিয়ে দিয়েছিল কে গো! বেচারির সে কী খোয়াড়—এক পা হাঁটতে পারে না, কৈলেশ থেকে ভক্তকে বর দিতে এসে শেষে দুড়ুম করে একটা আছাড় খেলে।

ছেলেবেলাতেই আমরা বুঝে নিয়েছিলুম ও থিয়েটার আর কিছু নয়, ও নিতান্তই থিয়েটারের খেলা। শুধু গ্রামসুদ্ধু লোককে ডেকে মাংস পোলাও খাওয়ানোর ব্যবস্থা। কিন্তু হারাণ অধিকারীর যাত্রা ও-রকম ছিল না। তার তলোয়ারের খেলা দেখে বুকের রক্ত চমকে উঠত, তার রাজার গলা মনে হত সিংহ গর্জনের মতো। তাই ওই থিয়েটারের নকল আমরা কখনো করিনি, যাত্রাই বেছে নিয়েছিলুম।

কিন্তু কাকা আমার ঘাড়ে হাত রাখলেন।

বললেন, হুঁ তোর মধ্যে বস্তু আছে দেখছি। এবার তোকে কাজে লাগাব। 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' প্লেটা নামাচ্ছি, রোহিতাশ্বের পার্টটাই দেব তোকে।

বিমু বললে, বাবা আমাকেও পার্ট দিয়ো একটা।

কাকা বললেন, তোর মাথায় গোবর—তোকে দিয়ে কোন কিচ্ছু হবে না।—নিমুই হল জাত অ্যাক্টর—এবার ওকেই চান্স্ দিতে হবে।

বিমুর দু'চোখ চকচক করে উঠল একবার। আজ জানি, সে-ই ও প্রথম চ্যালেঞ্জ্ করেছিল আমাকে। তারপর সময় মতো ও ওর নিজের হিসেব বুঝে নিয়েছে—একটি কড়িও বাকী রাখেনি।

...বাইরের হাওয়ায় মোমবাতির আলোটা কাঁপছে। আমার ঘরটার ভেতরে কতগুলো ছায়া নেচে বেড়াচ্ছে যেন। না—সেই পিতৃপুরুষেরা নয়—আমার ঘরে পা দেবে এমন সাহস তাদের নেই। এই মুহূর্তে তারা হয়তো শূন্য মহলগুলোর এখানে-ওখানে নিরুপায় ক্রোধে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে রাতের অন্ধকারে, ফাটলে ফাটলে তক্ষক হয়ে হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমার ঘরে তাদের প্রবেশ নিষেধ—এখানে তারা কেউ ঢুকতে সাহস পাবে না।

কিন্তু মোমবাতির আলোটা কাঁপছে। কতগুলো ছায়া কাঁপছে ঘরের ভেতরে।

কিসের ছায়া? আমার জামা কাপড়ের, বাক্স বিছানার, আমার শরীরের?

না—না—তারো কিছু বেশি। বুঝতে পারছি আমার ঘরে অন্য কারা যেন এসেছে। আমি মদ খাইনি, আমার ব্যাধিগ্রস্ত লিভার থেকে ওরা আমার মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়ে পড়েনি। অনেকে এসেছে। জগৎ পাল? যার গলায়-দড়ি-দেওয়া শরীরটা ঘরের কড়িকাঠের আংটায় ঘড়ির দোলকের মতো দুলছিল আর দুলছিল?

চন্দনা? বিয়ে যার ফর্সা সাদা মুখখানা একেবারে নীল হয়ে গিয়েছিল? কোথায় দাঁড়িয়ে ও কে কাঁদছে চাপা গলায়? উষারানী? উষারানীই তো। আর ও কে এমন করে এগিয়ে যাচ্ছে চোরের মতো? বিনু?

কী পাগলামো।

কেউ নেই—কোথাও নেই। আমার এই ঘরে শেষ রাত্রি যাপন করছি আমি। মা-র মৃত্যুর পর থেকে, বাইরের মহলে যে ঘরটা আমি বেছে নিয়েছিলুম—সেই ঘরে আজ রাত্রেও আমি একেশ্বর। কাউকে ঢুকতে দেব না—কাউকে নয়। আজ এইখানে বসে আমি আমার নিজের কথার খাতাখানা একা বসে বসে উল্টে যাব, সে পাণ্ডুলিপির একটি পাতাও দেখতে দেব না কাউকে।

কত দিন আগে ফিরে গিয়েছিলুম? একচল্লিশ বছর? বেয়াল্লিশ বছর? তাই হবে।

মনে আছে প্রথম স্টেজে নামবার কথা। এ সেই নাটমন্দিরে বাড়ির ছেলেদের জুটিয়ে কঞ্চির তলোয়ার ঘুরিয়ে যাত্রা করা নয়। সত্যিকারের থিয়েটার। বাইরে বসে এতদিন ধরে অন্যকে নিয়ে মজা দেখেছি, এবার আমাকে নিয়ে অন্যের মজা দেখবার পালা। আমার বুক কাঁপতে লাগল।

বাবা বিশ্বামিত্র সেজেছেন। মাথায় প্রকাণ্ড জটা—গালে বিরাট দাড়ি। মুখ থেকে মদের গন্ধ আসছে, চোখ দুটো যেন জবার পাপড়ি।

আমার মুখে তখন মেক-আপ্‌ম্যান্‌ রঙ আর পাউডার মাখিয়ে দিচ্ছিল। সামনে একটা মস্ত আয়না, আমি চুপ করে বসেছিলুম, নানা কসরত করে আমার মুখ-গাল-ভুরু ঠিক করে দিচ্ছিল। এই সময় বাবা ঠিক আমার পেছনে এসে দাঁড়ালেন। ঘরে দুটো কারবাইড ল্যাম্প

জলছিল, পোড়া গ্যাস, তেল-রঙ আর পাউডারের গন্ধে আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল; অর্কেস্ট্রা বাজতে শুরু হয়েছে, একটু পরেই অভিনয় আরম্ভ হবে—আমার বুকের ভেতর সেই বাজনার তালে তুফান উঠছে—আর ঠিক সেই সময় মস্ত জটা প্রকাণ্ড দাড়ি আর মদের গন্ধ নিয়ে বাবা আমার পেছনে এসে দাঁড়ালেন।

আয়নার ভেতরে তাঁর একটা অদ্ভুত আর অবাস্তব প্রতিফলন দেখলুম আমি। পাউডারের গুঁড়ো লেগে এখানে-ওখানে ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া কাচের ওপর, রঙের ছিটে-ধরা আয়নায়, কারবাইডের আলোতে, এত চেনা মানুষ এত দূরে চলে যায় সে কথা কে জানত।

[পরে আমি জেনেছি জীবনকে ওইরকম একটা অদ্ভুত আয়নার মধ্য দিয়ে দেখাই অভিনয়। আর সেই আয়নার জগৎ একটা ভানুমতির দেশ। ওর মায়ায় যে ভুলেছে তার আর মুক্তি নেই। যা আছে, অথচ নেই; যা সত্যি তবুও সত্যি নয়; যে হাসি, যে কান্না এত কাছে অথচ এত দূরে হাত বাড়ালেই যা পাওয়া যায় বলে মনে হয়, অথচ হাত বাড়ালে একটা কঠিন শীতল আবরণে সমস্ত কামনা যেখানে প্রতিহত হয়, তা-ই অভিনয়ের জগৎ। যা শুধুই মায়া, তার হাত থেকে কোনদিনও মানুষের হয়তো পরিত্রাণ আছে; কিন্তু যা সত্যি এবং মায়া—যা হাতের একেবারে কাছে রয়েছে অথচ হাত বাড়িয়ে দিলে কোন মতেই পাওয়া যায় না—সেই সত্যে আকৃষ্ট আর স্বপ্নে উদ্‌ভ্রান্তকে কে মুক্তি দেবে? কে?

আমি জানতুম না, কার্‌বাইড্ ল্যাম্পের নীলচে আলোয়, পাউডারের কণায় ধোঁয়াটে আর রঙের ছিটেতে বিচিত্র আয়নাটায় সেদিন আমারই ভবিষ্যতের পথ আঁকা হয়ে গিয়েছিল।]

বাবা বললেন, কিরে নিমু, ঠিক আছিস তো?

ভরাট গম্ভীর গলা। একটু যেন জড়ানো। আয়নার মধ্যে একটা অবাস্তব প্রতিবিম্ব।

আমি মাথা নেড়ে জানালুম, ঠিকই আছি।

বাবা বললেন, দেখিস ঘাবড়ে গিয়ে সব গোলমাল করে ফেলিসনি। তা হলে কিন্তু কান উপড়ে ফেলব।

মেক্-আপম্যান বহুদিনের পুরোনো লোক। হেসে বললে, কিছু ভাববেন না মেজবাবু, তৈরী ছেলে আপনার। আজও তো শেষ মহলাটা দেখলাম। যেমন চালাক, তেমনি চটপটে। দেখবেন বেশ নামজাদা অ্যাক্টর হবে ভবিষ্যতে।

—নামজাদা অ্যাক্টর হয়ে আর দরকার নেই। আজকের রাতটা মানে মানে তরিয়ে দিক, তা হলেই যথেষ্ট।

আয়নায় বাবার পাশে আর একটি ছায়া পড়ল।

এই ছায়াটা অন্যরকম। মাথার মুকুটে যেন মণিমুক্তা ঝলমল করছে। পরণে রাজবেশ। কাকা এসেছেন। আজ তিনি রাজা হরিশচন্দ্র।

[কাকাকে হরিশচন্দ্রই বলা যায়। কি ভাবে সমস্ত জীবনটা নিয়ে জুয়ো খেললেন। পাশার দানে বারে বারে হেরে গেলেন—অথচ মনের দিক থেকে কোনদিন হার মানলেন না।]

কাকা আমার কাঁধে হাত রাখলেন। হাসলেন একটুখানি। রাজার সাজে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে।

নিজে তালিম দিয়েছি মেজদা। খুব পার্টস আছে ওর। দেখো, জমিয়ে দেবে।

বাইরে অর্কেস্ট্রার বাজনার ঝড় উঠছিল। মেক-আপ নিতে বসে বাইরের ড্রপ সীনটা এখন দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ওর ওপরকার ছবিটা চিরদিন আমার মনে একটা অপূর্ব দোলা লাগাত। নীল সমুদ্রের ওপর দিয়ে ফেনা কেটে জাহাজ চলেছে এইটেই আঁকা ছিল ওখানে। দর্শকদের মধ্যে বসে যখন থিয়েটার শুরু হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতুম, নেপথ্যে রসময় অর্কেস্ট্রায়

হারমোনিয়ম সেতার-বেহালা-তবলায় দ্রুতগতি সুর উঠত আর বাতাসে দুলত ড্রপ সীনটা, তখন মনে হত ওই সমুদ্রের ঢেউগুলো যেন সত্যিই জীবন্ত হয়ে উঠছে, চলার তালে তালে থরথর করে কাঁপছে জাহাজটা—এই বাজনা যেন সমুদ্রেরই গর্জন। আজও আমার সামনে সমুদ্র দুলতে লাগল, ঢেউয়ের ডাক শুনতে পেলুম—অনুভব করলুম—ওই জাহাজটায় চড়ে আমিও যেন কোনো অনির্দেশের পথে পাড়ি জমিয়েছি।

বাবা বললেন, আর দেরী কত? লোকে অধৈর্য হয়ে উঠেছে যে!

কাকা বললেন, হ্যাঁ, এইবারে ড্রপ তুলব।

জীবনে অনেক রাত এসেছে গেছে—কিন্তু সে রাত্রি আমি কখনো ভুলবো না। যে-রাত্রে কড়িকাঠের সঙ্গে জগৎ পালের শরীরটা খোলা জানালার ঝোড়ো হাওয়ায় ঘড়ির দোলকের মতো দুলছিল—তার ভয়ঙ্কর স্মৃতিও কি কখনও মুছে যাবার? কিন্তু সেই প্রথম অভিনয়ের মতো রাত আমার আর কখনো আসেনি।

লোকে বিয়ের রাতের কথা বলে—দ্যাট্ মেমোরেবল নাইট! বিয়ে আমি করিনি, সে অভিজ্ঞতা আমার নেই ; আমার অধিকাংশ বধূই তো একরাত্রির সঙ্গিনী, কাঞ্চন-মূল্যে কেনা। ফুলশয্যার জন্যে দুরু দুরু প্রাণে আমায় অপেক্ষা করতে হয়নি, নেশাভরা চোখে সব শয্যাই আমার কাছে সমান বলে মনে হয়েছে। সেই প্রথম অভিনয়ের রাতই আমার বিয়ের রাত, সে-ই আমার বাসর-শয্যা। বাল্য-বিবাহই বলতে পারা যায়। সারা জীবনে তার বাঁধন আর কাটল না। পরলোক মানি না, কিন্তু মৃত্যুর পরে আমার জন্যে কোনো জগৎ যদি থাকে—সেখানেও একটা বিরাট স্টেজ খাটানো আছে মনে হয়—ঐকতানও তার শুরু হয়ে গেছে, শুধু আমার জন্যেই এখনো তার ড্রপ ওঠেনি।

কিন্তু তার জন্য এখন ভাবব না। সেই রাত্রিটাকেই দেখতে পাচ্ছি চোখে।

অভিনয় শুরু হয়ে গেল। প্রথম প্রথম বুকের কাঁপুনি খানিকক্ষণ ধরে চলেছিল তাও মিথ্যে নয়; তারপরেই সব যেন কি রকম হয়ে গেল।

সামনে সারি সারি কারবাইড জ্বলছে, তার আলো যেন আমার রক্তের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল; আশপাশ থেকে হালকা মদের গন্ধ— উইংসের দুধার থেকে চুরুট সিগারেটের গন্ধ—পাউডার আর রঙের গন্ধ—সবই আমার নেশা ধরিয়ে দিল। চণ্ডীমণ্ডপ অন্ধকার করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে রাশি রাশি মানুষের মুখ। অথচ কাউকে চিনতে পারছি না, সব মিলিয়ে নিজের অস্তিত্ব আমি ভুলে গেলুম।

দৃশ্যের ফাঁকে ফাঁকে কারা যেন আমার পিঠ চাপড়ে দিচ্ছিল।

—বেশ হচ্ছে, চমৎকার হচ্ছে।

কিন্তু আমি সেই স্বপ্নের মধ্যেই তলিয়ে গেলুম, আচ্ছন্ন হয়ে ছিলুম সেই নেশার ঘোরেই। কাউকেই আর দেখতে পাচ্ছি না। অডিয়ান্সের সেই সারি সারি অবাস্তব মুখের ভেতরে সব একাকার হয়ে রয়েছে।

তারপর সেই দৃশ্য। সেই মৃত্যু দৃশ্য।

—মা—মা—মা—গো।

—কী হয়েছে বাপ রোহিত? কী হল তোর? তুই অমন করছিস কেন?

—পুষ্প শাখা থেকে কী যেন আমায় দংশন করেছে মা! আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে, তৃষ্ণায় আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে আমি যে আর সইতে পারছি না!

—মা—মা গো—

তারপর আমি লুটিয়ে পড়েছিলুম। আর আমাদের সেরেস্তার মানিকদা—সে-ই শৈব্যা সেজেছিল, বুকফাটা গলায় ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল : রোহিত-রোহিতরে! ওরে দুখিনীর বুকের ধন, ওরে আমার সর্বস্ব—তুই আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে যাসনে বাপ! চোখ মেলে চা রোহিত—একবার আমায় মা বলে ডাক—

খুব কেঁদেছিল মানিকদা। কিন্তু সেও তখন মানিকদা ছিল না—সেই অপূর্ব আয়নার জগতে চলে গিয়েছিল। আর নিশ্চল হয়ে পড়ে থেকে আমি ভাবছিলুম, সত্যই যেন আমি যুবরাজ রোহিতাশ্ব, কালসাপের ছোবলে মরণঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছি, আর বুকে মাথা রেখে হাহাকার করছে আমার মা!

আর শুনতে পাচ্ছিলুম ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ। যে মেয়েরা থিয়েটার দেখতে এসেছিলেন, তাঁরাও কাঁদছেন।

সীন পড়লে কাকা আমায় তুলে নিয়ে নাচতে লাগলেন।

—অদ্ভুড—অদ্ভুত। তুই সত্যিই জমিয়ে দিয়েছিস। আমি তখুনি বুঝেছিলুম, ছেলেটা জিনিয়াস।

তারপরে এল শ্মশানের দৃশ্য। সেই মিলন, সেই দেবতাদের আশীর্বাদ, রোহিতাশ্বের পুনর্জীবন, রাজা হরিশ্চন্দ্রের নতুন করে সব ফিরে পাওয়া। যখন শেষ হল, হাততালিতে ফেটে পড়ল চারদিক।

আমাদের গ্রাম-সুবাদের জ্যাঠামশাই পণ্ডিত মাধবচন্দ্র স্মৃতিরত্ন স্টেজে উঠে এলেন। পর্দা সরিয়ে দেওয়া হল। মাধব জ্যাঠা কাঁপা গলায় বললেন, আজকের অভিনয় অতি মনোরম হয়েছে, দেখতে দেখতে আমি অভিভূত হয়ে গেছি। আর সব চাইতে মর্মস্পর্শী অভিনয় করেছে রোহিতাশ্বের ভূমিকায় আমাদের পরম কল্যাণীয় শ্রীমান নির্মলকান্তি। আমি তাকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি এবং তাকে একটি রৌপ্য পদক উপহারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

কাকা শক্ত দুহাতে আমাকে ওপরে তুলে ধরলেন। করতালিতে যেন কানে তালা ধরে গেল আমার।

মুখের রং পরিষ্কার করে যখন শুতে এলুম, তখন রাত ফিকে হয়ে এসেছে, ঝিরঝির করে বইছে ভোরের হাওয়া। মা আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে থাবড়াতে লাগলেন ছোট ছেলেটির মতো।

—উঃ, কী কান্নাটাই আমায় কাঁদালে হতভাগাটা। ভাবলে বুক এখনো কাঁপে। আর কোনোদিন তোকে এই সমস্ত ছাইভস্ম থিয়েটার করতে দেব না। কখনো না।

ঘুম-জড়ানো দৃষ্টিতে আমি যেন দেখলুম মা-র চোখ জলে ভরে উঠেছে। ভারী একটা তৃপ্তিতে আমার সমস্ত ক্লান্তি জুড়িয়ে গেল। তারপর কখন যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলুম তা নিজেও জানি না।

তবে এইটুকু মনে আছে। একটা স্বপ্ন দেখছিলুম। সেই আয়নাটার স্বপ্ন।

না, এলিস্ থ্রু দি লুকিং গ্লাস বইটা তখনো আমি পড়িনি। কিন্তু সেই স্বপ্নে আমি দেখেছিলুম, আয়নার কাচের ভেতর দিয়ে একটা আঁকাবাঁকা সিঁড়ি কোথায়, কত দূরে যেন উঠে গেছে। আর সেই সিঁড়ি বেয়ে আমি চলেছি কোন আকাশ পেরিয়ে, কত তারা ছাড়িয়ে, তবু সিঁড়িটা আর কিছুতেই শেষ হয় না।······

একটা দমকা হাওয়ায় মোমবাতিটা নিবে গেল। আঃ, দেশলাইটা আবার কোথায় রেখেছি? আজ আর কোনো অন্ধকার আমার সইবে না। মোমবাতির শেষ টুকরোটা পর্যন্ত জ্বালিয়ে নিয়ে আমি নিজেকে আজ দেখে নেব।

এর মধ্যে রাত নটা বাজল? আশ্চর্য!

নিজের ভাবনার ভেতরে তলিয়ে আছি, কখন যে কানাইয়ের মা টেবিলের ওপর খাবার রেখে গেছে টেরও পাইনি। কাল সকালে

যখন চলে যাব, তখন ওর কথা ভেবেই আমার কষ্ট হবে খানিকটা। এই বাড়িতে ও-ই আমার শেষ বন্ধন। বন্ধনটা কঠিন নয়—তবু ছিঁড়ে যেতে মায়া লাগবে।

কিন্তু এখন আর খেতে ইচ্ছে করছে না। পরে দেখা যাবে।

সেই মেডেলটার কথা ভাবছি। মাধব কাকা একটা রূপোর মেডেল দিয়েছিলেন। কাকা দেখিয়ে বেড়িয়েছিলেন সবাইকে। আর বিনু কেবল বলেছিল, ইস্—ভারী মেডেল! অমন মরে গিয়ে আমিও মেডেল পেতে পারি।

—এটার তো ভারী হিংসে—বেজায় ছোট মন!—কাকা একটা চড় দিয়েছিলেন বিনুকে।

বিনু কাঁদেনি—ছুচোখে আগুন বৃষ্টি করে চলে গিয়েছিল।

সেই যে শুরু হল—তারপর থেকে ফিরে যাবার পথ আমার আর রইল না। সেই আয়নার জগতের আশ্চর্য হাতছানি আমি আর কিছুতেই ভুলতে পারলুম না। যা সত্য, তা প্রতিদিনের; তাকে চিনি জানি—ক্রমেই তা পুরোনো হয়ে যায়, রক্তকে নাচায় না—মনকে ভোলায় না; তাই পরমাসুন্দরী স্ত্রী সঙ্গে থাকতেও কখন মানুষের চোখ চলে যায় একটি সাধারণ শ্যামলা মেয়ের দিকে—যার একটি বিনুনী আর এক টুকরো শাড়ির আঁচল সামনের পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল—মুখখানাও আর দেখতে পাওয়া গেল না। সে সত্য হয়েও সত্য নয়—যতটা তাকে দেখা গেল—তারো অনেক বেশি না দেখা বিস্ময় সে বয়ে নিয়ে গেল নিজের চারদিকে। শুধু একটি বিকেল, খানিকটা মেঘভাঙা আলো, কোনো ফ্লাওয়ার স্টল থেকে একটুখানি গন্ধের উচ্ছ্বাস সেই মেয়েটির সঙ্গে জড়িয়ে রইল।

আসলে থিয়েটারেও এমনি করে যে জীবনকে পেয়েছি—অথচ পাইনি; সে জীবন সাধারণ বৈচিত্র্যহীনতার একটানা পুনরাবৃত্তি নয়; তার আবেগ, তার বিস্ময়, তার অস্বাভাবিকতা, তার বিচিত্রতা

সে বয়ে আনে। মিথ্যে হয়েও সে কী বিরাট সত্য। জীবন যদি আঙুর হয়—অভিনয় তার সুরা, তার তীক্ষ্ণ হিংস্র নির্যাস, তার নেশাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তোলে সেই রঙের গন্ধ—সেই আলো, নাটকীয় মুহূর্তের পর্দায় পর্দায় তোলা উত্তেজনা। তার স্বাদ যে একবার পেয়েছে, সে কি আর ফিরতে পারে?

মনে পড়ে কলকাতার সেই মধু মল্লিককে।

এককালে নামজাদা ছিলেন—বিশেষ করে কংসের পার্টে এক সময় খ্যাতি একেবারে ফেটে পড়েছিল তাঁর। তারপর বয়েস বাড়ল, দাঁত পড়ল, শরীর ভাঙল। অমন বিরাট শক্তিধর চেহারা একটা নুয়ে-পড়া কঙ্কালে পরিণত হল। 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়'—থিয়েটারে নবযৌবনের খাতায় মধু মল্লিক অতীতের একটা নাম হয়ে রইল কেবল।

তবু আসতেন। তবু ধর্ণা দিতেন থিয়েটারে,—দাও-না ভাই, একটা কিছুতে আমায় লাগিয়ে।

—আর কেন দাদা! ঢের তো হল। এবার বিশ্রাম নিন।

—বিশ্রাম আসে না। নতুন থিয়েটারে পোস্টার যখন পড়ে, তখন বুকের ভেতর যেন আগুন ধরে যায়। দাও-না একটা ছোট-খাটো কিছুতেই জায়গা করে। পয়সা চাই না—একটা বোতলের খরচ দিয়ো—ব্যাস।

—কেন দাদা আর পাগলামি করো। এককালে বড়ো পার্ট করতে, এখন ছোটখাটো ভূমিকায় নামলে তোমার কি মান থাকে? আর সে অন্যায় কি আমরা হতে দিতে পারি?

মধু মল্লিক এবার উত্তেজিত হতেন। দপদপ করত কালি-পড়া চোখ।

—বুঝতে পারছি, আমায় এড়াতে চাও। তোমাদের রেসের ঘোড়ার উপরেও দেখছি দয়া আছে। সে অচল হ'য়ে পড়লে তোমরা

তাকে গুলি করে মারো। কিন্তু তোমাদের যত নিষ্ঠুরতা মানুষেরই বেলায়। নতুন নতুন প্লে হবে—লোকে ভিড় করে আসবে, আলো জ্বলবে, অর্কেস্ট্রা বাজবে—আর আমি চুপ করে বসে থাকব, একা একা কষ্ট পাব বাতের যন্ত্রণায়? বলতে পারো এ আমি কেমন করে সইব?

এমনি এই নেশা। এমনি এই আকর্ষণ। পাদ-প্রদীপের আলোর ডাকে যে পতঙ্গ একবার ভুলেছে, পুড়ে সে মরবেই, তাকে বাঁচাবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। আমিও পুড়েছিলাম।

নিজের কথাতেই ফিরে আসি।

পরের বার আবার থিয়েটার। তারপর আবার—আবার! যে বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই, সেবারে 'সীতা' নাটকে আমার অভিনয়ের খ্যাতি আশে-পাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল।

অভিনয়ে মন যতই পড়ে থাকুক, লেখাপড়ায় কোনোদিন খারাপ ছিলুম না। গ্রামের স্কুল থেকে চারটে লেটার নিয়ে পাশ করেছিলুম। অল্পের জন্য ডিস্‌ট্রিক্‌ট্‌ স্কলারশিপটা পাইনি। হেডমাস্টার দুঃখ করে বলেছিলেন, পরীক্ষার পনেরো দিন আগেও যদি তুমি পাশের গ্রামে থিয়েটার করতে না যেতে তা হলে এটা হত না। যাক—কলকাতায় গিয়ে একটু মন দিয়ে পড়াশুনো কোরো—থিয়েটার নিয়ে মেতে থেকো না। সারাটা জীবন তো সামনে পড়েই আছে—যত খুশি থিয়েটার পরে করতে পারবে। তার আগে পরীক্ষার রেজাল্টটা ভালো করে নাও।

স্কলারশিপ না পেয়ে আমিও লজ্জিত হয়েছিলুম। থিয়েটারের পাগলামিই যে তার একটা বড়ো কারণ, সে কথাও আমি ভুলিনি। প্রতিজ্ঞা করলুম—আই-এ-তে আমি স্ট্যাণ্ড্‌ করবই।

প্রতিজ্ঞা! এখন ভাবতেও হাসি পায়।

বাইরে রাত ঘন হচ্ছে আরো। উঠোনে চামচিকে উড়ছে পাক

খেয়ে খেয়ে। একটা ছায়া সরে যাচ্ছে না? কার একটা অস্বাভাবিক দীর্ঘছায়া? কারও দুটো চোখ ওখানে জ্বলজ্বল করছে? নাকি—জোনাকি?

না—ভয় আমি আর পাই না। সব ভয়ের সীমা পার হয়ে এসেছি।

এইবারের ছবিটা কলকাতার।

নামজাদা কলেজ, নামকরা হোস্টেল। দোতলার ঘরে আরো দুজনের সঙ্গে সীট পেলুম। তারাও ফার্স্ট-ইয়ারের ছাত্র।

মফঃস্বলের ছেলেরা কলকাতার ছেলেদের সঙ্গে সহজে মিশতে পারে না, কিন্তু নিজেদের কাছে তারা অল্পেই আপন হয়ে ওঠে। একজন প্রণব, সে এসেছে পাড়াগাঁয়ের এক স্কুল-মাস্টারের ঘর থেকে, স্কলারশিপ নিয়ে। আর একজন তড়িৎ। তার বাবা চাকরি করেন পশ্চিমে—সেখান থেকে পাশ করে এসেছে কলকাতায় পড়তে।

তিনজনেই আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলুম। একসঙ্গে ক্লাসে বসা—একসঙ্গে বেড়ানো। আমি আর তড়িৎ যদিবা দু-একবার কলকাতায় এসেছি, প্রণব একেবারে আন্‌কোরা। তাই তিনজনেই যেন নতুন করে রোজ আবিষ্কার করতুম বিচিত্ররূপিণী কলকাতাকে। তার বিশাল গড়ের মাঠ—যত দূরে যাই ঘন সবুজের নির্জনতা আর ফুরোয় না। চৌরঙ্গীতে দেখি খালি সাহেব আর সাহেব—দেখি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে দিয়ে টগবগ করে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। দেখি, সন্ধ্যাবেলায় গোরা সৈন্যেরা কী চমৎকার ব্যাণ্ড্ বাজায় ইডেন গার্ডেনে। বেড়াতে গেছি আলিপুরের চিড়িয়াখানায়, স্টীমারে করে পার হয়েছি গঙ্গা—ছুটির দিন কেটেছে গাছের ছায়ায়—ঝিলের ধারে। হাওড়ার পুল খোলা হয়ে গেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি, কিভাবে বড়ো বড়ো জাহাজ তার তলা দিয়ে

বেরিয়ে যাচ্ছে। বেলেঘাটার নির্জন খালের ধার দিয়ে দিয়ে কতদূরে চলে গেছি। টালার প্রকাণ্ড সবুজ মাঠটায় কারা পিটিয়ে পিটিয়ে ক্রিকেট খেলছে অনেকক্ষণ ধরে তাই দেখেছি বসে বসে। ঢাকুরিয়ায় নতুন লেকের ধারে দাঁড়িয়ে দেখেছি, জলা আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শেয়াল ছুটে যাচ্ছে, গাছপালার মাথায় বিকেলের রঙ পড়েছে, চারদিক থেকে উঠেছে ঝিঁঝির ডাক। আর অন্ধকারে সাপ বেরুবার ভয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে এসেছি বাস ধরতে।

থিয়েটারের কথা তখন কিছুদিনের জন্যে মন থেকে মুছে গেছে। ক্লাস ভালো লাগে—নতুন ধরণের পড়ানোতে নতুন স্বাদ পাই, আর প্রণব প্রথম থেকেই পড়া শুরু করেছিল, তার সঙ্গগুণে আমরাও নিয়মিত পড়াশোনা করে যাই।

তড়িৎই একদিন বললে, ধেৎ, ফার্স্ট ইয়ারে অত পড়তে হয় না। কেউ-ই পড়ে না। চল, বায়োস্কোপ দেখে আসি।

প্রণব আপত্তি করল। বললে, লজিকের পড়াটা অনেকখানি এগিয়ে গেছে ভাই। একটু দেখে রাখি।

—আরে প্রফেসার সেনও আছে, লজিকও থাকবে। আজ রবিবারে অত পড়লে সরস্বতী চটে যাবেন। চল—ম্যাটিনিতে ম্যাডান থিয়েটারে যাই। খুব ভালো হ্যাণ্ডবিল দিয়েছে। একটা লোক সিংহের সঙ্গে লড়াই করছে আফ্রিকার জঙ্গলে।

শুনে লোভ হল প্রণবেরও। তবু গাঁইগুঁই করে।

কাকার সঙ্গে কলকাতায় এসে আমি বায়োস্কোপ দেখে গেছি, আমার ব্যাপারটা অজানা নয়। তড়িৎও দেখেছে কয়েকবার।

প্রণব একেবারে আন্‌কোরা। পর্দার ওপর জীবন্ত মানুষেরা চলে বেড়ায়, হাসে কাঁদে—এই পরম বিস্ময়টা ওকে না দেখালেই নয়। জোর করেই টেনে নিয়ে গেলুম।

ছবি আফ্রিকার জঙ্গলেরই বটে, কিন্তু আরো কিছু ছিল। বেপরোয়া শিকারীর সঙ্গিনী জুটেছিল একটি মেয়ে। সিংহ-শিকারের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি বিবসনা হয়ে স্নান করতে চলল ঝর্ণার জলে, সময়-অসময়ে তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে পুরুষটি চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিতে লাগল তার মুখ।

তড়িৎ কী ভাবছিল জানি না—আমার বুকের ভেতরে শিরশির করতে লাগল। ঠিক এ জিনিস এর আগে কখনো দেখিনি। আর প্রণব যে কখন থেকে দুহাতে মুখ ঢেকে বসেছিল, সে আমরা লক্ষ্যও করিনি।

পথে বেরিয়ে তড়িৎ বললে, চল—একটা রেস্টুরেণ্টে ঢুকে চা আর চপ খাই।

প্রণব বললে না—আমি খাব না।

—কেনরে, সেদিনও তো খেয়েছিলি।

—আমি এক্ষুণি ফিরে যাব বোর্ডিংয়ে।

গলার স্বরে চমকে উঠে আমরা দুজনেই ওর দিকে চেয়ে দেখলুম। মুখের রঙ ওর কেমন বদলে গেছে, চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের লাল। কেমন বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস ফেলছে।

—কিরে, কাঁদছিলি নাকি?

এবার রাস্তার ওপরেই কেঁদে ফেলল প্রণব: কেন এ-সব অসভ্য জিনিস দেখাতে আনলে? আমি আর কোনোদিন তোমাদের সঙ্গে আসব না—কখনো না।

আমরা দুজনেই লজ্জা পেলুম। শুকনো হাসি হেসে তড়িৎ বললে, তুই একেবারে পাড়াগেঁয়ে। আরে, বায়োস্কোপে তো ওসব থাকেই। আর সায়েব-মেমেরা ওতে কিছু মনে করে না।

—আমরা তো আর সায়েব নই। না ভাই, এ তোমাদের অন্যায় —ভারী অন্যায়।

অনেক কষ্টে সান্ত্বনা দিয়ে ওকে সেদিন বোর্ডিংয়ে আনা গেল। সেদিন ভালো করে খেলো না—টের পেলুম, সারাটা রাত ও বিছানায় জেগে ছটফট করছে।...

—বাবু খাবারটা খেলেন না এখনো? সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।

চমকে ফিরে এলুম আটত্রিশ বছর পরে। আমাদের এই পুরোনো শূন্য বাড়িটায়—সারি সারি কবরের মতো মহলগুলোর নিঃসঙ্গতায়, নিজের শেষরাত্রি যাপনের ঘরটিতে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে কানাইয়ের মা। এই বাড়ির সঙ্গে তারও পঞ্চাশ বছরের যোগ। আমার সঙ্গে সঙ্গেই সে যোগ ছিন্ন হয়ে যাবে চিরকালের মতো।

—নিন, খেয়ে নিন বাবু। বাসনগুলো ধুয়ে রাখব আমি।

লুচি এনেছে, দুটো তরকারী, একটু ক্ষীর, মিষ্টিও তার সঙ্গে। যাবার আগে একটু ভালো করে খাইয়ে দিতে চায়। সাধারণত রাতে দুখানা রুটি আর একবাটি দুধই আমার বরাদ্দ।

—এত কে খাবে কানাইয়ের মা?

—আপনিই খাবেন বাবু।

—কিন্তু আর তো এ-সব খেতে পারি না। লিভার যে সম্পূর্ণ বিদ্রোহ করে বসে আছে।

—অত কথা জানি না বাবু। খেতেই হবে। এবাড়ির অন্নের পাট তো চিরদিনের মতোই তুলে দিলেন। তবু যাওয়ার আগে—কানাইয়ের মা চোখে আঁচল দিলে।

আশ্চর্য লাগে! আজও আমার জন্যে কেউ কাঁদে—আজকেও আমার দুঃখে কারো চোখে জল আসে! অথচ আমি তো কারো কাছে কোনো দাবি রাখিনি! নিজের পায়ের চিহ্ন যেখানে পড়েছে নিজের হাত দিয়েই তা মুছে দিয়েছি। পৃথিবী আশ্চর্য—আরো আশ্চর্য মানুষের মমতা। কোথা থেকে সেই মমতা যে অবলম্বন

খুঁজে নেয়—তা সেই-ই জানে। শূন্য মূল হয়েও বুঝি তা ফুল ফোটাতে পারে।

লুচি-তরকারি—সমস্তই বিস্বাদ মনে হয়ে। তবু খেয়ে চলেছি। জীবনে কাউকে কিছু দিতে পারিনি—চলে যাওয়ার আগে মানুষকে আর আঘাত দিতে রুচি হয় না।

খানিক পরে বললুম, আর পারছি না।

—বাবু, এই মিষ্টিটা—

—না-না।—আমি গ্লাসের জলে হাতটা ধুয়ে ফেললুম।

কানাইয়ের মা বাসনগুলো গুছিয়ে নিলে। আঁচলে চোখ দুটো আবার মুছে ফেলে বললে, আর রাত করবেন না বাবু, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুন। কাল তো আবার খুব সকালেই নৌকো আসবে।

—আচ্ছা—আচ্ছা।

বাইরের উঠোন দিয়ে কানাইয়ের মা চলে যাচ্ছে, আমি দেখতে পেলুম। একটু পরেই যেন কোন্ দিকে মিলিয়ে গেল। এ বাড়ির রাত্রিকে আমার মতো ও-ও ভয় পায় না। হয়তো যে সব পূর্ব-পুরুষের প্রেতচ্ছায়া এখানে অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়, তারাও ওকে চিনে নিয়েছে।

আবার এসে বসলুম নিজের জীর্ণ ডেক চেয়ারটাতে। মোম-বাতির শিখাটা কাঁপছে হাওয়ায়। ঘরের মধ্যে কিসের ছায়া দুলছে? মানুষের? না—একখানা পোস্টারের।

পোস্টার!

'মিশরকুমারী।' অদ্য সন্ধ্যা সাত ঘটিকায়। আবন—সুরেন্দ্র-নাথ ঘোষ (দানীবাবু)।

হ্যাঁ—তড়িৎ আর প্রণবের কথা ভাবছিলুম। তারপর অনেকদিন বায়োস্কোপে যাওয়া হয়নি। প্রণবের জন্যেই আমরা নিজেদের সামলে নিয়েছিলুম।

তড়িৎ অবশ্য মধ্যে মধ্যে ছটফট করত। বলত, দূর—একঘেয়ে বেড়ানো আর ভালো লাগে না। ওই গুড্‌বয়টা ঘরে চুপচাপ পড়ে থাকুক—চল, তুই আর আমি বায়োস্কোপ দেখে আসি।

আমি বললুম, না—না, ওটা বন্ধুর ওপর বিশ্বাসঘাতকতা হবে।

তড়িৎ রাগ করত: নিজের মনেই পাপ আছে ওর। নইলে ওতেই এমন পাগলামো করে?

আমি চুপ করে যেতুম। পাপ কি আমার নিজেরও নেই? ওই ছবিটা কি আমারও মনের ভেতর অনেক দিন ধরে আনাগোনা করেনি, একটা চাপা উত্তেজনা মাথার কোষগুলোর ভেতরে ঝিমঝিম করে বাজতে থাকেনি? কিন্তু তড়িৎকে সে কথাটা বলা গেল না।

সেদিন ঠাণ্ডা লেগে একটু জ্বর-জ্বর হয়েছিল। কী একটা খেলা ছিল গড়ের মাঠে—প্রণবই তড়িৎকে টেনে নিয়ে গেল। এইখানেই প্রণবের নিজের খানিকটা উৎসাহ ছিল, সে ভালো ফুটবল খেলোয়াড়।

খেলার ব্যাপারে আমার কোনোদিনই কৌতূহল নেই—তার ওপর শরীর খারাপ—আমি বোর্ডিংয়েই ছিলুম। শুয়ে থাকতেও ইচ্ছে করছিল না—উঠে দাঁড়িয়েছিলুম জানলার ধারে। সেই সময় সামনের দেবদারু গাছটায় একটা পোস্টার আমি দেখতে পেলুম। নিচের দিক থেকে আঠা খুলে গিয়ে একটা পতাকার মতো দুলছিল সেটা।

প্রথমটা ভালো করে লক্ষ্য করিনি, তারপরে চোখে পড়ল। বড়ো বড়ো লাল-নীল হরফে ছাপা। উপরে থিয়েটারের নাম, তার নীচে:

শনিবার ও রবিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায়

মি শ র কু মা রী

আবনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন:

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)।

আমার মাথার মধ্যে হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ চমকালো! সর্দিজ্বরের প্রভাবে অশান্ত চঞ্চল স্নায়ুতে একটা চকিত উত্তেজনা জাগল: যেন অনেকদিন পরে হৃৎপিণ্ডে শুনতে পেলুম জলদে তবলা চলছে, রক্তের মধ্যে ঘূর্ণি তুলছে অর্কেস্ট্রা। দেখলুম, মেক-আপ রুমের সেই মায়া-মুকুরের সামনে এসে আমি দাঁড়িয়েছি, সেই রঙ—সেই স্পিরিট—সেই পাউডারের গন্ধ আমায় ঘিরে ধরেছে। একটু পরেই ড্রপ উঠবে, দ্রুতগতিতে আমি পার্টের ওপর চোখ বুলিয়ে চলেছি।

সামনের লাল-নীল হরফগুলো বিকেলের আলোয় যেন অদ্ভুত রূপ ধরল, যেন জীবন্ত হয়ে উঠল তারা, আর ওই পোস্টারটা ক্রমাগত হাতছানি দিয়ে আমাকে ডেকে চলল।

এই ছ'মাস ধরে—থিয়েটারের ইন্দ্রপুরী এই কলকাতায় বসে—থিয়েটারকে আমি ভুলেছিলুম কী করে? অথচ এই থিয়েটারের কত বর্ণনাই না শুনেছি কাকার মুখে। তার দৃশ্যপট, তার অভিনয়—তার উন্মাদনা। সামনে সুধীর সমুদ্র রয়েছে—আর এক বুক পিপাসা নিয়ে আমি এমনিভাবে পড়ে আছি এখানে!

বাধা একটা নিশ্চয়ই আছে।

বোর্ডিংয়ের কড়া নিয়মে ছাত্রদের সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার মধ্যে ফিরে আসতেই হবে। আর সে নিয়ম মানতে গেলে থিয়েটার দেখা কোনো মতেই সম্ভব নয়। ম্যাটিনী শো-তে বায়োস্কোপ দেখেই আশ মেটাতে হবে।

বায়োস্কোপ।

পর্দার ওপরে কতগুলো ছবি চলে বেড়াচ্ছে কেবল। কিন্তু তারা শুধুই ছবি, শুধুই আলোর খেলা; প্রাণের ছোঁয়া নেই, রক্তমাংসের উত্তাপ নেই কোনোখানে। কী হবে ওই সব ছবি দেখে? কী অর্থ হয় ও-সবের?

শনিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায়। আজই তো শনিবার। আর একটু আগেই তো কোথায় একটা পেটা ঘড়িতে পাঁচটা বাজল।

আমি আর থাকতে পারলুম না। সামনের দেবদারু গাছটা থেকে পোস্টারটার হাতছানি যেন বুকের সমস্ত নাড়ীগুলোকে ধরে নিষ্ঠুরভাবে আকর্ষণ করতে লাগল। নিজের রক্তে অর্কেস্ট্রার ঘূর্ণি শুনতে শুনতে কখন আমি কাপড়-জামা পরে নিলুম, দরজার তালা বন্ধ করলুম, তারপর নেমে এলুম রাস্তায়।

সেদিন থিয়েটারে সামনে এসে কতক্ষণ যে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলুম জানি না।

সামনে পোস্টারের পর পোস্টার—নামের পর নাম। এই সব নামগুলোকে কতদিন রূপকথার মত শুনেছি, কতদিন ধরে ওরা স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। আজ তারা আমার কাছ থেকে মাত্র হাতকয়েক দূরে, রাস্তাটা পার হয়েই আমি পৌঁছে যেতে পারি, একখানা টিকেট কিনতে পারি, ভেতরে গিয়ে বসতে পারি। তারপরেই আমার চোখের সামনে মায়াপুরীর দরজা খুলে যাবে, ঝলমল করে উঠবে অপূর্ব সমস্ত দৃশ্যপট, অপরূপ সজ্জায় দেখা দেবে আমার কল্পলোকের সেই সব স্ত্রী-পুরুষ—যাদের নামে সারা বাংলা দেশ পাগল হয়ে যায়।

আমার সামনে দিয়ে একে একে লোক ঢুকতে লাগল থিয়েটারে। টুকরো টুকরো কথা শুনতে পাচ্ছি।

—আমি রবিবারেও এসেছিলুম রে। সত্যি বলছি, ফাটিয়ে দিচ্ছে একেবারে।

—কী চমৎকার বুলা এসেছে দেখেছিস।

—নতুন মেয়ে। খাসা চেহারা ভাই। পার্শী থিয়েটারের চটকদার মেয়েগুলোকেও টেক্কা দিয়ে যায়।

—খুব নাম করবে—তোকে বলে দিচ্ছি।

আমি যেন ঘুমের ঘোরে শুনতে লাগলুম। একটার পর একটা ল্যাণ্ডো, ফিটন—ঢাকা গাড়ি এসে থামতে লাগল থিয়েটারের সামনে। হাতে মালা জড়িয়ে নামল সৌখিন পুরুষের দল, গায়ে ভারী ভারী গয়না পরে নামল ঘোমটা-পরা সব বৌ আর মেয়েরা, সঙ্গে ঝি চলল পানের বাটা আর হাত পাখা নিয়ে। আতর আর বেলফুলের গন্ধে ভরে উঠল চারদিক।

—ওই দেখ ন'কড়ি মল্লিক এসেছে।

—সঙ্গে ওটা কে বল তো! নতুন কাকে আবার জুটিয়েছে দেখছি।

—চিনলি নে? ওতো রামবাগানের পদ্ম। আগে এই থিয়েটারেই সখী হয়ে নাচত। এখন বড়ো কাপ্তেন বাগিয়েছে, বক্সে বসে থিয়েটার দেখছে আজকাল।

আমি সেই স্বপ্নজগতের সীমানায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, নিজের অসুস্থ স্নায়ুতে আরো কিছুক্ষণ ঝড়ের তাণ্ডব শুনলুম। তারপর রাস্তার এপার থেকেও কানে এল অর্কেষ্ট্রার চাপা গর্জন। এখুনি থিয়েটার আরম্ভ হবে।

আর—আর—এখুনি ট্রামে না উঠে বসলে আমি সাড়ে সাতটার মধ্যে হোস্টেলে ফিরতে পারবো না।

চূড়ান্ত খিদের মুখে জীবনের সব চাইতে সুখাদ্য ফেলে আসবার অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে যখন আমি বোর্ডিংয়ে ফিরে এলুম, তখন ঠিক সাড়ে সাতটা। গেট বন্ধ করবার জন্যে তৈরী হচ্ছে দারোয়ান। এক মুহূর্তের জন্য ইচ্ছে হল দারোয়ানটার গালে প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিই একটা।

নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলুম।

প্রণব আর তড়িৎ অপেক্ষা করছিল বাইরে। আমাকে দেখেই চটে উঠল।

—এই, কোথায় গিয়েছিলি? একঘণ্টা ধরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি দরজার ধারে।

—একটু বেরিয়েছিলুম।

—কেন বেরুলি? বলিসনি—তোর জ্বর?

—একা একা বসে থাকতে ভালো লাগছিল না।

প্রণব বললে, খেলার মাঠে গেলেই পারতিস—শরীর ঠিক হয়ে যেত। নে—চাবি খোল্—

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আমি সোজা বিছানায় শুয়ে পড়লুম।

—কী হল রে তোর?

—দারুণ মাথা ধরেছে ভাই—চোখ বুজেই জবাব দিলুম।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে প্রণব ব্যস্ত হয়ে উঠল: মাথাটা টিপে দেবে?

—না, দরকার নেই। একটু চুপ করে শুয়ে থাকলেই ঠিক যাবে।

ওরা দুজনে কিছুক্ষণ খেলার মাঠের গল্প করল। ক্যালকাটা টীমের ব্যাকটার পা দুটো দেখছিস ভাই? যেন থামের মতো। আর ওই বুট! কী করে এগোবে বাঙালী খেলোয়াড়েরা বল্‌তো! তবু কিন্তু কুমোরটুলীর মিত্তিরের সাহস খুব। একটা গোল তো ঢুকিয়ে দিলে। কিন্তু কুমোরটুলীর গোলকীপারটাই কোনো কাজের নয়—শেষের দুটো গোল ওর দোষেই তো হল।

ওদের কথাগুলো আমার কানে যাচ্ছিল, কিন্তু মনের ভেতরে একটার পর একটা মিশকুমারীর দৃশ্য অভিনয় হয়ে চলেছে। নাটকটা আমি জানি—পড়েছি। আমার বাড়িতেও অভিনয় হয়েছে। কিন্তু কলকাতার থিয়েটার তো সে ছেলেখেলা নয়। কল্পনায় আমি

আবনের অভিনয় দেখছিলুম—শুনতে পাচ্ছিলুম সামন্দেশের নিষ্ঠুর কণ্ঠস্বর—সেই সুন্দরী মেয়েটি—যে পার্শি থিয়েটারের রঙিন মেয়েদেরও হার মানায়—তার গান আমার দু কান ভরে বাজছিল। আমার চারদিকে তখন বড়োবড়ো জুড়ি ফিটন, ল্যাণ্ডো এসে থামছিল—আতরের আর বেলফুলের মালায় সব যেন মদির হয়ে উঠছিল।

বোধ হয় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলুম—একটু একটু করে তলিয়ে গিয়েছিলুম স্বপ্নের ভেতর। দেখি, আমাকে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিচ্ছে তড়িৎ।

—এই উঠবিনে? খাওয়ার বেল পড়েছে যে।

—আমার জন্যে একবাটি দুধ পাঠিয়ে দিতে বলিস। আর কিছু খাব না।

—তোর জ্বর বেড়েছে নাকি? সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলব?—পাড়াগাঁয়ের ছেলে প্রণব আবার চঞ্চল হয়ে উঠল।

—খেতে যাচ্ছিস—যা না? কেন বিরক্ত করছিস আমাকে?—রূঢ় গলায় আমি জবাব দিলুম।

তড়িৎ বললে, আচ্ছা—থাক থাক—ওকে চুপ করে শুয়ে থাকতে দে। চল—আমরা যাই—

বায়োস্কোপ দেখে এসে যেমন বিনিদ্র রাত কেটেছিল প্রণবের, তেমনি ভাবে সে রাতেও আমি ঘুমুতে পারলুম না। সারারাত সেই ফুল আর আতরের গন্ধ আমাকে প্রদক্ষিণ করল, সেই আয়নায় দেখা পথটা একটা পোস্টার হয়ে আমাকে ক্রমাগত হাতছানি দিয়ে চলল—আর চোখের সামনে মিশরকুমারীর একটার পর একটা দৃশ্য অভিনীত হতে লাগল। অদ্ভুত সে অভিনয়—অপূর্ব তার গান—ইন্দ্রোলোকের চাইতেও তা আশ্চর্য আর মায়াময়।

রবিবার সকালে যখন বিছানায় উঠে বসলুম, তখন রাত্রের জ্বরটা

ছেড়ে গেছে। আর সেই সঙ্গে মনও স্থির হয়ে গেছে আমার। আজ মিশরকুমারী আমি দেখবই। তারপর যা হওয়ার হোক।

তড়িৎকে ডেকে চুপি চুপি বললুম কথাটা।

শুনে, তড়িৎ চমকে উঠল।

—যাবি কী করে? সাড়ে সাতটায় তো গেট বন্ধ হয়ে যায়।

—আগেই বেরিয়ে যাব।

—ফিরতেও তো হবে।

—সেজন্যে আমাদের জানলার পাশেই তো ছাদের নলটা রয়েছে।

তড়িতের চোখ কপালে উঠে গেল সে কথা শুনে।

—বলিস কিরে! এ-যে রীতিমতো গোয়েন্দা গল্প! নল বেয়ে উঠে আসবি?

—আমরা পাড়াগাঁয়ের ডানপিটে ছেলে।—আমি আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলুম: নারকেল-সুপুরির গাছে ওঠার অভ্যেস করেছিলুম। জলের নল তো তার কাছে রীতিমতো সিঁড়ি!

—শেষ রাতে উঠে আসবি নল বেয়ে?

—দেখিস, ঠিক চলে আসব।

এইবার তড়িৎ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল হাঁ করে। তারপর খানিকটা বোকার মতো হেসে বললে, যাঃ, তুই ঠাট্টা করছিস নিশ্চয়।

—ঠাট্টা করছি কিনা আজ রাতেই দেখতে পাবি নিজের চোখে।

—কিন্তু ভাই, কেউ যদি টের পায়?—তড়িতের মুখে চোখে আতঙ্কের ছায়া পড়ল: তা হলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে।

—কে টের পাবে? আমাদের এই ঘরটা একেবারে কোণায়। ওধারের ওই জানলা দিয়ে সোজা নেমে যাব গলির মধ্যে—দিনের বেলাতেও ও পথে লোক চলে না। কে দেখতে আসছে শেষ রাতে?

—যদি রাস্তার পুলিশে দেখতে পায় ?

—পুলিশকে আমি ভয় করি না।

তড়িৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বললে, এ-সব মতলব ছেড়ে দে ভাই। তুই তো মারা পড়বিই, আমাদেরও তাড়িয়ে দেবে বোর্ডিং থেকে।

—বলেছি তো কোনো ভাবনা নেই। তুই-ও চল্‌না।—আমি হাসলুম।

—ওরে বাবা! তড়িৎ ভয়ে শুকিয়ে গেল : আমার অত সাহস নেই। তাছাড়া ওই পাইপ বেয়ে উঠতে গেলে আমি হাত পা ভেঙে মারা পড়ব। এসব মতলব করিসনি নির্মল। কেন খামোখা—

আমার রাগ হয়ে গেল। বললুম, তবে যা, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে নালিশ করে আয়। বলগে যা যে নির্মল চৌধুরী আজ থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে, শেষ রাতে পাইপ বেয়ে ফিরে আসবে।

তড়িতের মুখ এইবার কালো হয়ে গেল।

—তুই কি আমাকে ট্রেটার ভাবিস ? একথা বললি কী করে ?

—তা হলে চুপ করে থাক। কেবল দেখে যা—আমি কী করি।

তড়িৎ আরো কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর বললে, কিন্তু প্রণব ? আমি না হয় একরকম বুঝতে পারছি, কিন্তু তোর এই মতলব শুনলে ওর মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

—ওকে কিছু বলতে হবে না।

—বা-রে ? সন্ধ্যের পর তোকে না দেখলে—

—বলবি, আমার মামার অসুখের খবর পেয়ে কালীঘাটে চলে গেছি।

—আর শেষ রাতে ফিরে আসবার সময় ? তখন যদি দেখতে পায় ?

—মড়ার মতো ঘুমোয়। ওই গুণটা ওর আছে।

—আর ভোরে উঠে যদি জিজ্ঞেস করে, কালীঘাট থেকে রাতে ফিরলি কী করে?

—বলব, সুপারিন্টেণ্ডেন্টের স্পেশ্যাল পারমিশন ছিল, দারোয়ান গেট খুলে দিয়েছে।

তড়িৎ দুটো বিহ্বল চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

—সত্যি বলছি ভাই, তুই যে এমন ডেঞ্জারাস ছেলে, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

—এখন বুঝি ভয় করছে আমাকে দেখে? আমার সঙ্গে আর মিশতে চাসনে?

—না ভাই—ভক্তি হচ্ছে তোর ওপর। পায়ের ধুলো দে।

এতদিন পরে তড়িতের কথা মনে পড়ে হাসি পাচ্ছে আমার। সেদিন ও কতটুকু আমাকে চিনেছিল? আমার ভেতরে যে উদ্দাম বন্যতা পাদপ্রদীপের আলোয় বার বার সমস্ত বল্‌গা ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে তার হিংস্র রূপটাকে কতখানি কল্পনা করতে পেরেছিল ও? ও কি ভুলেও ভাবতে পেরেছিল, কী ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য আমি জন্ম নিয়েছি? আমার রক্তের মধ্যে কী আগুন যে জ্বলছে, তার কতটুকু উত্তাপ ও অনুভব করেছিল সেদিন?

আমার জানলার বাইরে উঠোনের ওপর ঘন কালো হয়ে অন্ধকার নেমেছে। মোমবাতির আলোয় আমার একটা ছায়া যে ওখানে গিয়ে পড়েছে, তা আমি এই প্রথম লক্ষ্য করতে পারলুম। সেদিন এম্‌নি করে আমার ছায়াটাই যেন আমায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল। নিজের উগ্র আকাঙ্ক্ষার এম্‌নি একটি আলোর ভেতর দিয়ে আমি অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলুম—আমার চারপাশে অন্ধকারের ভেতরে আর কিছুই আমি দেখতে পাইনি।

নিষেধ ভাঙার সমস্ত উত্তেজনা নিয়ে আমি থিয়েটারে গিয়ে

বসলুম। আমার চারদিকে অচেনা—অদ্ভুত সমস্ত মানুষের ভিড়। টুকরো টুকরো কথা—হাসি গল্প, আতর আর পাউডারের গন্ধ, পান-জর্দা-সিগারেট, হাত-পাখার হাওয়া। সামনে বিরাট ড্রপসীন—তার আড়াল থেকে কী পাগল করা ঐকতানের সুর। আমাদের বাড়ির থিয়েটার, তার পরিবেশ, সমস্তই এখন আমার কাছে নিছক ছেলে-খেলার মতো মনে হল।

আর অভিনয়।

মদ তখনো আমি খাইনি, তার স্বাদ—তার প্রভাব আমার কাছে তখনো অজানা তখনো অচেনা। কিন্তু থিয়েটার শেষ হওয়ার পরেও কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মতো বসে রইলুম নিজের জায়গায়। অভিনয়! অভিনেতা হিসেবে পাড়াগাঁয়ে কিছু সুনাম আমার হয়েছিল—একটু অহঙ্কারও যে ছিল না—নিজের কাছে এত বড় মিথ্যা কথা বলবার ইচ্ছেও আমার নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে একটা কথা আমার মনে হল। কলকাতার এই সেরা দর্শকদের সামনে যদি এমনি করে কোনোদিন অভিনয় করতে পারি—এমনি করে সকলের মনের ভেতর নেশার দোলা জাগিয়ে দিতে পারি—তবেই আমি অভিনেতা।

প্রায় এক মাইল নির্জন পথ বেয়ে আমি যখন ফিরে এলুম, তখন গ্যাসের আলোয় আমার সেই ছায়াটা ছাড়া আর কোনো সঙ্গী কোথাও ছিল না। কয়েকবার কুকুর ডাকল, আমার পায়ের শব্দে ডাস্টবিন থেকে ইঁদুর ছুটে পালালো, দেখলুম গ্যাসপোস্ট্ জড়িয়ে ধরে মাতাল টলছে আর বিড়বিড় করছে। কিন্তু আমার চাইতে বড়ো মাতাল সে রাত্রে কোথাও কলকাতায় ছিল না।

তারপরে জলের পাইপ। আমার সুপুরি গাছে ওঠার অভিজ্ঞতায় ছেলেখেলার মতই মনে হল। যখন ঘরে পা দিলুম, জানালার কাছে তড়িৎ তখন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে।

—এলি? ফিস ফিস করে জানতে চাইল। ভয়ে ওর সারা গা কাঁপছিল।

—দেখতেই পাচ্ছিস। —আমি হাসলুম: দিব্যি দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলুম।

—এই, আস্তে—আস্তে। প্রণব জেগে উঠবে।

—জাগবে না, ওর নাক ডাকছে।—নিজের সীটে এসে জামা খুলতে খুলতে আমি বললুম, তুইও সারারাত জেগেছিস নাকি রে?

—কী করব। যা ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছিস, ঘুম আসে?

—যা নিশ্চিন্তে শুয়ে পড় এখন—ঘুমো।

এইবার আমার দু চোখ বেয়ে ঘুম নামল। অনেকখানি দুঃসহ উত্তেজনার পর তৃপ্ত অবসাদের ঘুম। প্রণব আর ঘুমুতে পারল কিনা আমি জানি না—জানবার জন্যে কোনো কৌতূহলও আমার ছিল না।

সেই শুরু—কিন্তু সারা নয়। যে নেশার ফাঁদে পা দিয়েছি, তা থেকে আর পরিত্রাণ কোথায় আমার!

পরের শনিবার। তার পরের রবিবার। তড়িৎ শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলে। কালীঘাটে মামার অসুখের গল্পও প্রণবকে আর ভোলাতে পারল না।

তারপর প্রণব একদিন ছেলেমানুষের মতো কাঁদল অনেকক্ষণ।

—ভাই নির্মল, তুই যে এমন অধঃপাতে যাবি তা কোনোদিন ভাবিনি।

আমি কর্কশ গলায় বললুম, তোমাকে উপদেশ দিতে হবে না। তুমি আমার মরাল গার্জেন নও।

তড়িৎ বাধা দিতে চেষ্টা করল: ও তো তোর ভালর জন্যেই বলছে। বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস। একদিন গেছিস সে আলাদা কথা, তাই বলে প্রত্যেক সপ্তাহে—

—আমার যা খুশি করব, তোমার কী?

প্রণব সেদিনই ঘর বদলালো। তেতালায় একটা খালি সীট ছিল—চলে গেল সেখানে। আর আশ্চর্যভাবে নীরব হয়ে গেল তড়িৎ। মধ্যে মধ্যে এমন ভাবে আমার দিকে তাকাতো যে মনে হত ভূত দেখছে।

আমি গ্রাহ্য করি না—কাউকে না। বুঝতে পেরেছি, থিয়েটার না দেখলে আমি বাঁচব না। শনিবারের বিকেলে সূর্যের আলো লাল হয়ে উঠলেই আমার রক্তে ঢেউ ওঠে—স্টেজের আলোগুলো আমার প্রত্যেকটা নাড়ীকে ধরে নিষ্ঠুর হাতে আকর্ষণ করে; আমি ফিরতে পারি না—ফেরবার পথ আমার আর নেই।

তারপর—

একদিন শেষ রাতে পাইপ ধরে খানিকটা উঠেছি, এমন সময় কে যেন বজ্র-হাতে আমার পা টেনে ধরল।

—শালা চোর।

তাকিয়ে দেখলুম, পুলিশ।

জানি, খেলা শেষ হয়ে গেছে। তবু আত্মমর্যাদায় ঘা লাগল। বললুম, এই, গালি মৎ দেনা!

কনস্টেবল আমাকে টেনে নামালো। আর কী বলতে যাচ্ছিলুম, প্রকাণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিলে। মাথা যেন ঘুরে গেল আমার। তারপর গলা চড়িয়ে কনস্টেবল হাঁক ছাড়ল: এ সুপারিটন বাবু—এ সুপারিটন সাহেব! হোস্টেল মে চোর ঘুষতা থা—পকড় লিয়া।

হস্টেলের জানলায় সারি সারি মুখ দেখা দিল।

দুখানা মুখ আমি চিনতে পারলুম। একখানা তড়িতের—মড়ার মতো বিবর্ণ। আর একখানা সুপারিন্টেণ্ডেন্টের। অনেকখানি ঝুঁকে পড়ে তিনি জানতে চাইছেন: কাঁহা চোর, কেইসা চোর?

একগ্লাস জল খাওয়া যাক। বুকের ভেতরটা শুকিয়ে উঠছে।

রাত কটা হল? এগারোটার কাছাকাছি। শুয়ে পড়ব?

না—আজ আর আমার ঘুম আসবে না, এখনো আমার অনেক কাজ বাকী। এই রাতেই—আজকের এই শেষ রাত্রিটিতেই—এই বাড়ির সব হিসেব-নিকেশ আমায় চুকিয়ে নিতে হবে। আর আমার সময় নেই।

সেই দিনের কথা ভাবছি। কলেজ-জীবনের আপদ মিটিয়ে যেদিন সরস্বতীর কাছ থেকে বিদায় নিলুম। তারপর থেকে উর্বশীর বন্দনার পালা। হাতের পাত্রে যার সুরা, চোখের দৃষ্টিতে যার বিষাক্ত মাদকতা।

বিচার হল প্রিন্‌সিপ্যালের ঘরে। প্রিন্‌সিপ্যাল ছিলেন, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, কলেজ-কমিটির আরও একজন কেউ ছিলেন বলে মনে পড়ে।

প্রথমেই তড়িতের পালা।

—তুমি এর সঙ্গে থিয়েটারে যেতে?

তড়িতের ঠোঁট কাঁপল একবার।

—না স্যার, কোনোদিন আমি যাইনি।

—নির্মল যে এমনি করে বেরিয়ে যায়, তা নিয়ে কেন রিপোর্ট করোনি তুমি?

তড়িৎ মাথা নিচু করে রইল।

—পঁচিশ টাকা ফাইন হল তোমার। এই ওয়ার্নিং। ভবিষ্যতে আর কিছু ঘটলে তোমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে কলেজ আর বোর্ডিং থেকে। যাও—

তড়িৎ বেরিয়ে গেল।

এইবার ঘরসুদ্ধ লোকের অগ্নিদৃষ্টি পড়ল আমার দিকে। যেন দৃষ্টি দিয়েই পুড়িয়ে মারতে চাইছে।

প্রিন্সিপ্যাল দাঁতে দাঁতে চাপলেন: কিছু কৈফিয়ত আছে তোমার?

—না স্যার।

—তুমি লজ্জিত ?

—না স্যার।

সমস্ত ঘরটা যেন বারুদখানার মতো স্তব্ধ হয়ে রইল। আর আমি দাঁড়িয়ে রইলুম সেই বিস্ফোরণের চূড়োয়।

প্রিন্সিপ্যাল কিছুক্ষণ নিথর ভাবে বসে রইলেন। তারপর বললেন, আমার সারা জীবনে এমন বেয়াদপ বদমায়েস ছেলে আমি দেখিনি। তোমাকে কলেজ থেকে রাস্টিকেট করা হল। আর আজই বিকেলে তুমি বোর্ডিং ছেড়ে দেবে। ছিঃ ছিঃ, দেশ কোন্‌দিকে যাচ্ছে! এদের হাতেই কি জাতির ভবিষ্যৎ—

শেষের নীতিবাক্যগুলো শোনবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, প্রবৃত্তিও না। আমি বেরিয়ে এলুম। কলেজ-ভর্তি ছেলে যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে এমনি করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আর হোস্টেলে ফিরেই টেলিগ্রাম পেলুম একটা।

মহালে বেরিয়ে নৌকাডুবিতে একসঙ্গেই মারা গেছেন দুজন। বাবা আর কাকা।

মোমবাতির দ্বিতীয় শিখা

॥ ১ ॥

মোমবাতিটা পুড়ে এসেছে অনেকখানি। রাত বারোটার মতো হবে মনে হয়। আমার চেয়ারটা থেকে একটু নুয়ে পড়ে হাত বাড়ালেই ঘড়িটা আমি পেতে পারি। কিন্তু কোনো উৎসাহ বোধ করছি না। আজকের এই শেষ রাত্রিটায় সময়ের কোনো হিসেব আমি আর করতে চাই না। সব হিসেবের পাট আমার মিটিয়ে দিয়েছি।

যার সময় আছে, সে-ই হিসেব করে। আমার সময় ফুরিয়ে গেছে অনেকদিন আগেই, এখন তো আমি একটা শূন্যতার ভেতরে বাস করছি। কাল সকালেই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। কোন্ পথের ধারে—কোন্ সরাইখানায়—কোন্ হাসপাতালের একান্তে এই জীর্ণ শরীরটা চিরদিনের মতো ছুটি পাবে সে আমি জানি না। মদ ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু এখন ছাড়া-না-ছাড়া দুই-সমান। এই মুহূর্তেই একটা তীব্র যন্ত্রণার উৎক্ষেপ টের পাচ্ছি লিভারের ভেতর। হয়তো আজ রাত্রেই—এই ঘরেই—এই টেবিলটার ওপরেই আমার মৃত্যু হতে পারে।

কিন্তু আজ কিছুতেই মরব না—এ বাড়িতে কোনোমতেই আমি মরব না। পিতৃপুরুষদের ক্লীব অভিশাপকে কোনো মতেই জিততে দেব না আমি। চিরদিন তাদের উপেক্ষা করে এসেছি—যাওয়ার আগেও তাদের সমস্ত ক্রোধকে তুচ্ছ করে চলে যাব।

আমারও কৈফিয়ত আছে। আমারও অধিকার আছে প্রশ্ন করবার।

জানালা দিয়ে মোমবাতির আলোয় আমার যে ছায়াটা বাইরে

ছড়িয়ে পড়েছে, আর একটা চকিত ছায়া দুলে গেল তার ওপর দিয়ে। কা ও? বাদুড়? জানি না। কিন্তু আমি কাকার কথা ভাবছি। এই মুহূর্তে কাকা যদি আমার সামনে এসে দাঁড়ান, আমি বলব, তুমি—তুমিই। তুমিই তো আমাকে সেই মায়া-মুকুরের পথ দেখিয়েছিলে, সর্বনাশের নেশা নাচিয়ে দিয়েছিলে রক্তের ভেতর। তোমরা দু-কূল বাঁচিয়ে চলেছো, আমি পারিনি। কিন্তু তার জন্মে সব দোষই আমার? তোমাদের সকলের বিষ কি তোমরা আমার মধ্যেই ঢেলে দাওনি—তোমাদের সকলের পাপ চাপিয়ে দাওনি আমার ওপর?

আমি তো একটা ব্যক্তি-মানুষ নই—আমি পরিণাম। তোমাদের সকলের পরিণাম। বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে জমিদারীর পত্তন করেছিলে, তারপর বংশধারায় ধাপে ধাপে যে নির্ভুল অঙ্কটি সাজিয়ে গেছ, আমি তার যোগফল! কেন আমার ওপরে আজ তোমাদের যত ক্রোধ—যত জ্বালা? তোমাদের সকলের পাওনা শাস্তি আমার ওপরেই চাপিয়ে দাও কেন?

কিন্তু ছায়ার সঙ্গে তর্ক করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। ঘুরুক—ঘুরুক—ওরা অন্ধকারেই ঘুরপাক খেয়ে চলুক একটানা। বাদুড় আর চামচিকে হয়ে এই সাতমহলা বাড়িটাকে প্রদক্ষিণ করতে থাকুক, দালানে দালানে ছায়া ফেলে নিরুপায় যন্ত্রণায় মাথা খুঁড়ুক, দেওয়ালের ফাটল থেকে তক্ষকের বিকট গলায় প্রহরে প্রহরে আর্তনাদ তুলুক। আমি ওদের গ্রাহ্যও করি না।

নিজের চিন্তাতেই ফিরে আসি আবার।

মোমবাতিটা জ্বলছে তাকে ঘিরে ঘিরে পোকা এসেছে অনেকগুলো। ওদের কি আমি চিনি? যারা ওর শিখায় পুড়ে মরবার জন্মে ছুটে এসেছে—কে কে আছে তাদের মধ্যে? মধু মল্লিক? উষারাণী?—আমি?

আমার কথাই ভাবছি।

হোস্টেলে পা দিয়ে যখন টেলিগ্রাম পেলুম, তখন সমস্ত পৃথিবীটা পায়ের তলায় দোলা খেয়ে উঠল। কলেজে যা ঘটেছে তার জন্যে আমার মন সম্পূর্ণ তৈরী ছিল, আমি জানতুম এ ছাড়া কিছু আর হতেই পারে না। পাহারাওয়ালার হাতে ধরা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই জানি, কলেজের পাট আমার চিরদিনের মতো মিটল। দু পাশে ছাত্রের দল যখন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আমায় দেখছিল, তখন বরং নিজের মধ্যে যেন অনুভব করছিলুম সম্রাটের মহিমা— ওদের দেখছিলুম অনুকম্পার দৃষ্টিতেই। কিন্তু এ কী হল। বাবা আর কাকা এই ভাবে, এক সঙ্গে—

এ কি হয়! একি হতে পারে?

মাটিতে টলে পড়ে যাচ্ছিলুম, কে যেন দু-হাতে আমায় জড়িয়ে ধরল। তড়িৎ? প্রণব? আমি জানি না।

তবু দেশে ফিরে এলুম। আমি আর বিনু পাশাপাশি বসলুম শ্রাদ্ধ করতে।

—যো জীবা অনলদগ্ধা—

তারপর আস্তে আস্তে শোকের তুফান স্তব্ধ হয়ে গেল। আমারও আর কলকাতায় ফেরা হল না। কলেজে কী ঘটেছে, সেখানে আমি কী করেছিলুম, সে খবর জানাবার কেউ রইল না। কাউকেই দিতে হল না কৈফিয়ত।

বিনুর তখনো স্কুলের পালা শেষ হয়নি। খুড়তুতো ভাইবোনেরা সবাই তখনো ছেলেমানুষ। শুধু আমারই বয়েস সতেরো বৎসর। জীবনের অভিজ্ঞতা যদি কিছু থাকে, আমারই আছে।

পুরোনো কর্মচারীরা এসে বললেন, নিমু—এখন তুমিই বুঝে নাও সব। তোমার ওপরে আর তো কেউ নেই।

সেরেস্তায় গিয়ে বসতে আরম্ভ করলুম।

সেই খাজনা, চেক দাখিলা, তামাদি, নালিশ, লাটের কিস্তি, উচ্ছেদ, সার্টিফিকেট—এক বিরাট আর বীভৎস ব্যাপার। মাথা ধরে উঠত। সকালে যে দু'তিন ঘণ্টা সেরেস্তায় গিয়ে বসতুম, সে সময়টাকে নরক যন্ত্রণার মতো মনে হত আমার কাছে। কখন দু'চোখে আমার ঝিম ধরত, দেখতে পেতুম বড়ো বড়ো জুড়ি গাড়ি এসে থামছে থিয়েটারে সামনে, আতর আর ফুলের মালার গন্ধে ভরে যাচ্ছে চারদিক, কিংবা থিয়েটার শেষ হয়ে গেলে মেয়েদের মাঝখানে এসে থিয়েটারের ঝি ডাক দিচ্ছে: নেবুতলার মিত্তির বাড়ির সব কই গো? তোমাদের গাড়ি এয়েচে গো।

হঠাৎ হয়তো চমক ভেঙে যেত নায়েব মশাইয়ের ডাকে।

নিমু, এগুলোতে একটু সই করে দাও বাবা। আর পলাশ-ডাঙা থেকে এই প্রজারা সব এসেছে তোমার কাছে। ওদের ওখানে একটা নতুন হাটের পত্তন নিয়ে কী দরবার করতে চায়।

উঃ—কী যন্ত্রণাতেই পড়া গেল!

মাস ছয়েক পরে মা একদিন বললেন, বাবা আর একটি কাজ আছে যে!

আমি মা-র মুখের দিকে তাকালুম।

কথাটা বলতে গিয়ে মা-র চোখ জলে ভরে গেল। আঁচলে চোখ মুছে বললেন, ওঁরা অপঘাতে গেলেন, গয়ার প্রেতশিলায় পিণ্ডি না দিলে তো ওঁদের গতি হবে না। তোকেই কাজটা করে আসতে হয় যে।

খুশি হয়েই রাজী হয়ে গেলুম। প্রত্যেক দিন সকালে সেরেস্তা নিয়ে বসাটা আমার কাছে আতঙ্ক হয়ে উঠেছিল। কোনোমতে এখন এই জেলখানা থেকে বেরুতে পারলেই মুক্তি পাই।

তিন চারদিন বাদেই রওনা হয়ে পড়লুম গয়াতে।

মা বললেন, কাউকে সঙ্গে নিয়ে যা বাবা একা অতদূর যাবি!

বললুম, আমি এখন বড়ো হয়ে গেছি মা, কিছু ভেবো না।

ট্রেনে উঠে যেন ছুটির পৃথিবীটার স্বাদ পাওয়া গেল। পৌঁছুলুম গয়াতে। কোনো বেগ পেতে হল না। আমাদের বাড়ির পাণ্ডার কথা আমি জেনেই গিয়েছিলুম, তাকে খুঁজতে হল না আমায়। একটা বিরাট খাতা বের করে সে-ই আমাকে চিনে নিলে। দেখলুম, আমার বাবা কাকা থেকে আরম্ভ করে সাতপুরুষের কে কবে গয়ায় এসেছিলেন, তার বিস্তৃত বিবরণ তার খাতার পাতায় পাতায় সাজানো আছে।

'আকাশস্থ নিরালম্বঃ বায়ুভূতে নিরাশ্রয়ঃ'—

দিন তিনেক গয়ায় কাটিয়ে মনে হল, এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব না, এদিক-ওদিক বেড়িয়ে যাই কিছুদিন। ফিরে গেলেই আবার সেরেস্তার সেই কুম্ভীপাক—সেই আদায়-তশীল, মামলা-মোকর্দমা, লাটের খাজনার হিসেব-নিকেশ! আর একটু মুক্তির আনন্দ উপভোগ করা যাক।

চলে এলুম কাশীতে।

বিশ্বনাথের মন্দিরে যাই আরতি দেখতে, কখনো বা টাঙ্গা নিয়ে সারনাথের নির্জন পথ ধরে এগিয়ে চলি। যে ধর্মশালায় উঠেছিলুম সেখানকার বন্দোবস্তও খুব ভালো। একটা দীর্ঘ অবসাদ আর অনিশ্চয়তার পরে যেন ধীরে ধীরে আমি সুস্থ আর স্বাভাবিক হয়ে উঠছিলুম।

এমন সময়—

সেদিন সন্ধ্যার সময় হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির দিকে রওনা হয়েছি। জর্দা-দেওয়া এক খিলি পান খেয়েছি, কেমন ঝিমঝিম করছিল মাথার ভেতরে। কখন চলতে চলতে ডান দিকের একটা রাস্তা ধরেছি জানি না।

আমার চটকা ভাঙল। ফুলের গন্ধ, আতরের গন্ধ। এইটুকু

রাস্তায় শৌখিন সাজপোশাক-পরা মানুষের ভিড়, প্রায় সকলেরই চোখ ওপরের দিকে। তারপর কানে এল বাজনার আওয়াজ, গানের শব্দ।

ওই গন্ধ—বাজনার আওয়াজ—গানের সুর। চারপাশের মানুষগুলোর চোখে—চলায়—কথার ভঙ্গিতে নেশার রঙ। আমি জানতুম না এ কাশীর বিখ্যাত রাস্তা, বিশ্বনাথের গলির পরেই এর খ্যাতি। রাস্তার সাইনবোর্ডে এবার নামটা দেখতে পেলুম: 'ডাল-কি-মণ্ডি'।

দু-পাশে সারি-দেওয়া দোতলার ঝুল-বারান্দা। তাতে চুপ করে বসে আছে মেয়েরা। উজ্জ্বল সাজ—আরো উজ্জ্বল কটাক্ষ। প্রায় বাড়ি থেকেই রাস্তা পর্যন্ত সিঁড়ি নেমে এসেছে, দু-একজন মানুষ হাতে মালা জড়িয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে। গানের আওয়াজ আসছে—তবলা চলছে দ্রুত লয়ে।

প্রথমে ভেবেছিলুম, কলকাতার সেই মেয়েরা—যারা এমনিভাবে শরীরের পশরা সাজিয়ে বসে থাকে। ভারী লজ্জা হল। রাস্তা থেকে জোরে বেরিয়ে আসছি, কাদের কথা আমার কানে এল।

—তামাম হিন্দুস্থানকো সবসে অচ্ছী বাঈ লোগ রহতী হিঁয়া পর। আপ্ তো বহুৎ সমঝদার আদমি—চলিয়ে না—দেখিয়ে না কেইসা গানা আপ্ হিকে শুনাউঁ!

তা হলে এরা সেই কাশীর বাঈজীর দল। যাদের গানের খ্যাতি এত শুনেছি!

আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। রক্তের ভেতরে সেই ঘূর্ণিটা আবার পাক খেয়ে উঠল। সেই গন্ধ—সেই মাদকতা—সেই পরিবেশ। আমার মনের ভেতর যেন থিয়েটারের অর্কেস্ট্রা বাজতে লাগল। কী করছি ভালো করে বোঝবার আগেই সামনে যে সিঁড়িটা পেলুম, তাই বেয়ে উঠে গেলুম ওপরে।

একটি কাঠের চৌপাই নিয়ে বসেছিল কুড়ি একুশ বছরের মেয়েটি। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো। সঞ্চারিণী লতার মতো ছন্দিত দীর্ঘ শরীর। সুন্দরী কিনা বলতে পারি না—সুদর্শনা। পরনে লাল পেশোয়াজ, গায়ে কাঁচুলির ওপর নীল রেশমের ওড়না। সাপের মতো একটি বিলম্বিত বেণী কোমর ছাপিয়ে নীচে নেমে এসেছে।

মেয়েটি মধুর হাসি হেসে বললে, আইয়ে শেঠজী—আইয়ে।

বারান্দার পরেই একটি ছোট হলঘর। মেজেতে ফরাস বিছানো। দেওয়ালে আয়না—নানা রকমের রঙিন ছবি। ফরাসের ওপরে পড়ে আছে কয়েকটি বাদ্য-যন্ত্র—ইতস্তত-ছড়ানো গুটিকয়েক তাকিয়া।

পাকা চুল, শাদা কাপড়-পরা এক বুড়ী বসে পান সাজছিল। হেসে বললে, বৈঠিয়ে।—মুখের আদল থেকে মনে হল, মেয়েটির মা।

পকেট থেকে দুখানা দশ টাকার নোট বুড়ীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম, গান শুনব।

মায়ের হয়ে মেয়েই বললে, ম্যায় তো আপকো সেবা কি লিয়ে। —একটা তাকিয়া আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, আরাম কিজিয়ে।

মা একটা পানের বাটা এনে আমার সামনে রাখল। তারপর বললে, সঙ্গতী লোগোঁকো বোলা না।

আমি একটা তাকিয়ায় ঠেশান দিয়ে অভিভূতের মতো বসে রইলুম। যেন এখনো কিছু বুঝতে পারছি না—যেন এখনো তলিয়ে আছি স্বপ্নের মধ্যে। তারপর কখন সঙ্গতীরা এল, সারেঙ্গীর সুর উঠল, তবলা বাজল—আমি কিছু যেন ভালো করে টেরই পেলুম না। সুশিক্ষিত তীক্ষ্ণ গলায় ঘরখানা ভরে উঠল ধীরে ধীরে—দেখলুম আশ্চর্য আবেশে দুটি সুর্মাপরা কালো চোখ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে,

শ্যামল সুকুমার একটি ললাটের ওপর সোনার টিক্‌লিটি জ্বলজ্বল করছে রাজটিকার মতো।

একটি গান শেষ হল। আর একটি। আরো একটি তার পরে।

—আপকো পসন্দ হুয়া শেঠজী?

আমার ঘোর ভেঙে গেল। বললুম, হুঁ খুব ভালো লাগল।

—বাঙালী লোগ বহুৎ সমজদার হোতা!—মেয়েটির মুখ ভরে উঠল প্রসন্নতার হাসিতে।

আমি উঠে পড়লুম এবার। বললুম, আজ চলি।

নমস্কার জানিয়ে মেয়েটি বললে, মেহেরবানি করকে ফির আনা। সর্‌সতীকো ভুলিয়ে মৎ!

তা হলে সর্‌সতী—সরস্বতী মেয়েটির নাম। একেবারে বেমানান নয়। তানপুরা নিয়ে মগ্ন দৃষ্টিতে ওর গান গাওয়ার মধ্যে অমনি একটা ছবি যেন ফুটে উঠেছিল কোথাও।

আমি শুধু বললুম, আচ্ছা—আসব।

রক্তের ভেতর একটা উত্তেজনা নিয়ে—হৃৎপিণ্ডে অদ্ভুত দ্রুত আর প্রবল স্পন্দন শুনতে শুনতে আমি ফিরে এলুম। সারারাত ছাড়া-ছাড়া ঘুম আসা-যাওয়া করতে লাগল, আর তার ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পেলুম, সরস্বতী গান গাইছে—তার কপালে সেই সোনার টিক্‌লিটা ঝিকমিক করছে রাজটিকার মতো।

পরের দিন আবার গেলুম।

সন্ধ্যার ছায়া নামতে-না-নামতেই আমি পা দিলুম ডাল-কি-মণ্ডিতে। জানতুম—বাঈয়ের অভাব নেই এখানে, আমার জন্যে কোনো স্থানাভাব কখনো ঘটবে না। কিন্তু শুধু গানের জন্যে নয়—আমি যে বিশেষভাবে কখন সর্‌সতীর কথাই ভাবতে শুরু করেছিলুম—সে আমি জানি না। মনের ভেতর এই আশঙ্কাটাই বোধ হয়

ঘুরছিল, আমি আসবার আগেই আর কেউ পাছে সর্‌সতীর ঘর অধিকার করে বসে!

তখনো ডাল্‌-কি-মণ্ডি জমে ওঠেনি—তখনও তার মাদকতার পালা শুরু হয়নি। বারান্দায় সর্‌সতীকে আমি দেখতে পেলুম না।

সর্‌সতীর মা আমাকে দেখে পরম আদরে অভ্যর্থনা করল।

—আইয়ে—আইয়ে—

কিন্তু হিন্দি আর আমার ভালো লাগছে না। হিন্দিতে প্রত্যেকটা কথাও মনে করতে পারছি না। আমার স্মৃতির ভেতরে যে-ভাবে তারা বাঁধা পড়েছে—সেই ভাবেই নিজের কাছে নিজের কথাগুলো বলে যাব।

সর্‌সতীর মা বলেছিল, মেয়ে আমার স্নান করছে। তৈরী হয়ে আসবে একটু পরেই। ততক্ষণ বোসো, গল্প করো। চা আনাই?

—দরকার নেই। চা এখুনি খেয়ে আসছি।

—তা হলে পান?

—তারও দরকার নেই। পান আমি বেশি খাই না। আর কাশীর মশলা-দেওয়া পান খেলে আমার মাথা ঘোরে।

তারপর বুড়ী আমার পরিচয় নিতে লাগল। ভারী ছেলেমানুষ দেখছি। বাড়ি কোথায়? কে আছে? সাদী করেছ? না—তাও তো বটে, এত কম বয়সে বাঙালীর সাদি হয় না। তুমি জমিদারের ছেলে? ভারী রেইস্‌ আদমী? তা তো হবেই। সে আমি দেখেই বুঝেছিলুম। জমিদারের ছেলে না হলে এমন চেহারা হয়—এমন আমিরী মেজাজ হতে পারে?

তখন ঘরে এল সর্‌সতী।

ঘরে আলো জ্বলছিল—সে আলো যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। আজ পরনে গোলাপী রঙের শাড়ি, কপালে কাঁচপোকার

টিপ। সন্তোস্নান আর প্রসাধনের গন্ধে মনে হল, এক মুঠো ফুল যেন শরীর নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো।

হাসিতে ভরে উঠল সরস্বতীর মুখ।

—কী ভাগ্য আমার। আজই আবার পায়ের ধুলো পড়ল।

মা বললে, ভালো করে খাতির কর্ বেটী। মস্ত জমিদারের ছেলে—তা জানিস? বড়া রেইস্ আদমী।

সরস্বতীর দুটো চোখ এসে যেন আমার বুকে বিঁধল। বললে, আমি জানতুম। হাতের হীরের আংটিটা দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম। তারপর আমার পাশে বসে পড়ে থুতনিতে ছোট একটা টোকা দিয়ে আদর করে বললে, রাজাবাবু!

মেয়েদের হাতের ও-রকম স্পর্শ আমার জীবনে সেই প্রথম। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ ছুটে গেল। আমি সরে বসলুম।

সরস্বতী একটু হাসল। তারপর বললে, মা—সঙ্গীদের ডাকো।

গান কী শুনলুম—আজকে আমার কাছে তা আরো যেন অস্পষ্ট হয়ে গেল। আমি সেই স্পর্শটুকুর অগ্নি-চমক নিয়ে ফিরে এলুম ধর্মশালায়। তারপর দেশে চিঠি লিখলুম, কাশীতে আমি আরো কিছুদিন থাকব, আমাকে চারশো টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

পরের দিন। তার পরের দিন। তারও পরের দিন। হাওয়ায় উড়ে যেতে লাগল সময়—তার সঙ্গে টাকা। কিন্তু কোন ক্ষোভ, কোন গ্লানি আর তখন ছিল না। বিশ্বনাথ গেল, গঙ্গায় বেড়ানো গেল, সারনাথের সেই লাল ধুলোয় ভরা নির্জন পথটার কোনো আকর্ষণই আমার আর রইল না। আমি শুধু অপেক্ষা করতুম, কখন সন্ধ্যা আসবে—কখন আমি আবার ডাল্-কি-মণ্ডিতে গিয়ে পৌঁছুব।

সেদিন আকাশ মেঘ-ঢাকা। অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়ছিল। তবু তার মধ্যেই আমি বেরিয়ে পড়লুম।

সরস্বতী আজ যেন অন্য দিনের চাইতে বেশী প্রসাধন করেছিল। কী রঙের ওড়না আর শাড়ি পরেছিল জানি না—আমার চোখের রঙে সব রঙ যেন একাকার হয়ে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল, সারা গায়ে যেন ওর আগুন জ্বলছে।

বললে, মা বলছিল, আজ বাদলায় তুমি কিছুতেই আসবে না। আমি বললুম, নিশ্চয় আসবে। ওর সঙ্গে যে 'প্যার' হয়ে গেছে আমার।—বলেই হেসে উঠল খিল্‌খিল্‌ করে।

'আপনি' থেকে সম্ভাষণটা 'তুমি'-তে নেমেছিল ক'দিন আগে, কিন্তু শেষ কথাটার জন্যে মন তখনো তৈরী ছিল না। হৃৎপিণ্ডের ভেতরে আমি যেন মেঘের ডাক শুনলুম—মাথার রক্ত ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। আর সরস্বতী—সরস্বতী আমার থুতনিতে টোকা দিয়ে দিয়ে সুর ধরল: 'ক্যায়সে আওয়ে পিয়া হো মেরি সৈঁইয়া—'

—কী বদ্‌জাতি করছিস?—সরস্বতীর মা ধমক দিলে একটা।

কিছুই নয়—হয়তো সামান্য একটু দুষ্টুমি—একটুখানি অন্তরঙ্গতার সমাদর। কিন্তু ওর কৌতুকভরা চঞ্চল চোখের দিকে তাকিয়ে আমার সারা শরীরে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বইতে লাগল। আমি মাথা নীচু করে ফরাসের ওপর বসে পড়লুম।

গানের পর গান চলল—সুরট মল্লার—মিঞাকি মল্লার—নট মল্লার। আর বাইরে দুর্যোগ আরো ঘন হয়ে উঠতে লাগল। ডাল্‌-কি-মণ্ডীর আলো-ঝলমল পথটা কখন দপ করে ডুবে গেল অন্ধকারে —সরস্বতীর ঘরের আলোটাও তৎক্ষণাৎ মুহূর্তে মৃত্যুর ভেতরে লুকিয়ে পড়ল। একটা চিৎকার উঠল কোথাও: 'বিজলী কি তার টুট গিয়া—'

বাইরে ঝড় গজ্‌রে বেড়াচ্ছে—বৃষ্টির আর বিরাম নেই। কোত্থেকে কয়েকটা মোমবাতি জ্বেলে আনল সরস্বতীর মা। কিন্তু গান আর বেশীক্ষণ জমল না। ডাল্‌-কি-মণ্ডীর সব কোলাহল থেমে

টিপ। সদ্যোস্নান আর প্রসাধনের গন্ধে মনে হল, এক মুঠো ফুল যেন শরীর নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো।

হাসিতে ভরে উঠল সর্‌সতীর মুখ।

—কী ভাগ্য আমার। আজই আবার পায়ের ধুলো পড়ল।

মা বললে, ভালো করে খাতির কর্ বেটী। মস্ত জমিদারের ছেলে—তা জানিস? বড়া রেইস্ আদমী।

সর্‌সতীর দুটো চোখ এসে যেন আমার বুকে বিঁধল। বললে, আমি জানতুম। হাতের হীরের আংটিটা দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম। তারপর আমার পাশে বসে পড়ে থুতনিতে ছোট একটা টোকা দিয়ে আদর করে বললে, রাজাবাবু!

মেয়েদের হাতের ও-রকম স্পর্শ আমার জীবনে সেই প্রথম। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ ছুটে গেল। আমি সরে বসলুম।

সর্‌সতী একটু হাসল। তারপর বললে, মা—সঙ্গতীদের ডাকো।

গান কী শুনলুম—আজকে আমার কাছে তা আরো যেন অস্পষ্ট হয়ে গেল। আমি সেই স্পর্শটুকুর অগ্নি-চমক নিয়ে ফিরে এলুম ধর্মশালায়। তারপর দেশে চিঠি লিখলুম, কাশীতে আমি আরো কিছুদিন থাকব, আমাকে চারশো টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

পরের দিন। তার পরের দিন। তারও পরের দিন। হাওয়ায় উড়ে যেতে লাগল সময়—তার সঙ্গে টাকা। কিন্তু কোন ক্ষোভ, কোন গ্লানি আর তখন ছিল না। বিশ্বনাথ গেল, গঙ্গায় বেড়ানো গেল, সারনাথের সেই লাল ধুলোয় ভরা নির্জন পথটার কোনো আকর্ষণই আমার আর রইল না। আমি শুধু অপেক্ষা করতুম, কখন সন্ধ্যা আসবে—কখন আমি আবার ডাল্-কি-মণ্ডিতে গিয়ে পৌঁছুব।

সেদিন আকাশ মেঘ-ঢাকা। অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়ছিল। তবু তার মধ্যেই আমি বেরিয়ে পড়লুম।

সরস্বতী আজ যেন অন্য দিনের চাইতে বেশী প্রসাধন করেছিল। কী রঙের ওড়না আর শাড়ি পরেছিল জানি না—আমার চোখের রঙে সব রঙ যেন একাকার হয়ে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল, সারা গায়ে যেন ওর আগুন জ্বলছে।

বললে, মা বলছিল, আজ বাদলায় তুমি কিছুতেই আসবে না। আমি বললুম, নিশ্চয় আসবে। ওর সঙ্গে যে 'প্যার' হয়ে গেছে আমার।—বলেই হেসে উঠল খিল্‌খিল্ করে।

'আপনি' থেকে সম্ভাষণটা 'তুমি'-তে নেমেছিল ক'দিন আগে, কিন্তু শেষ কথাটার জন্যে মন তখনো তৈরী ছিল না। হৃৎপিণ্ডের ভেতরে আমি যেন মেঘের ডাক শুনলুম—মাথার রক্ত ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। আর সরস্বতী—সরস্বতী আমার থুতনিতে টোকা দিয়ে দিয়ে সুর ধরল : 'ক্যায়সে আওয়ে পিয়া হো মেরি সৈঁইয়া—'

—কী বদ্‌জাতি করছিস ?—সরস্বতীর মা ধমক দিলে একটা।

কিছুই নয়—হয়তো সামান্য একটু দুষ্টুমি—একটুখানি অন্তরঙ্গতার সমাদর। কিন্তু ওর কৌতুকভরা চঞ্চল চোখের দিকে তাকিয়ে আমার সারা শরীরে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বইতে লাগল। আমি মাথা নীচু করে ফরাসের ওপর বসে পড়লুম।

গানের পর গান চলল—সুরট মল্লার—মিঞাকি মল্লার—নট মল্লার। আর বাইরে দুর্যোগ আরো ঘন হয়ে উঠতে লাগল। ডাল্-কি-মণ্ডীর আলো-ঝলমল পথটা কখন দপ করে ডুবে গেল অন্ধকারে —সরস্বতীর ঘরের আলোটাও তৎক্ষণাৎ মুহূর্তে মৃত্যুর ভেতরে লুকিয়ে পড়ল। একটা চিৎকার উঠল কোথাও : 'বিজলী কি তার টুট গিয়া—'

বাইরে ঝড় গজ্‌রে বেড়াচ্ছে—বৃষ্টির আর বিরাম নেই। কোত্থেকে কয়েকটা মোমবাতি জ্বেলে আনল সরস্বতীর মা। কিন্তু গান আর বেশীক্ষণ জমল না। ডাল্-কি-মণ্ডীর সব কোলাহল থেমে

গেছে—ঝড় আর বৃষ্টির গন্ধ্‌ গ্লানি ছাড়া কোথাও আর কিছু নেই যেন। সঙ্গতীরা একটু পরেই বাজনা রেখে ঘর থেকে চলে গেল—এই ঝড়-বাদলের মাঝখানে তারা যে কোথায় গেল জানি না।

উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললুম, চলি।

সরস্বতী পথ আগলে বললে, কোথায় যাবে এই তুফানের ভেতর ? বিজলীর তার ছিঁড়ে গেছে।

—তা হোক, তা হোক, আমি যেতে পারব।

—না, যেতে পাবে না। বিজলীর ছেঁড়া তার গায়ে লাগলে জান খতম হয়ে যাবে। 'পেড়্‌' ভেঙে পড়তে পারে মাথার ওপরে। তারপর গুণ্ডা আছে—বদমাস আছে। ইয়ে কাশী হ্যায়—বহুৎ খারাব জায়গা। তুমি এইখানেই থাকো আজ।

—এখানে ?

—হ্যাঁ এখানে। কোনো ভয় নেই তোমার। আমি তো আছি। —সরস্বতীর চোখ থেকে বিদ্যুৎ এসে বিঁধল আমার বুকে। আমি না বলতে পারলুম না, সমস্ত ইচ্ছাশক্তি আমার হারিয়ে গিয়েছিল।

রাত্রে পুরি এল, মিঠাই এল, রাবড়ি এল। কিছু খেলুম—প্রায় সবটাই পড়ে রইল। তারপর সেই ফরাসের ওপরেই কোথা থেকে নরম তোষক আর বালিশ এনে দিলে সরস্বতী, বললে, আব আরামসে নিঁদ করো।

কিন্তু ঘুম আসছে না। ঝড়ের হাওয়া—বৃষ্টি শব্দ—অজানা বিছানা—অস্বাভাবিক পরিবেশ। আমি ছটফট করছিলুম। টুকরো টুকরো চেতনা ঘুম আর জাগরণের মধ্যে আসা-যাওয়া করছিল।

হঠাৎ কে যেন আমার পাশে এসে বসল। নিয়ে এল উগ্র খানিকটা সৌরভের উচ্ছ্বাস—আর—আর তার সঙ্গে এল—আমি জানি, বাবার কাকার মুখ থেকে অনেকবার পেয়েছি—মদের গন্ধ!

জড়ানো গলায় কে যেন বললে, ঘুম আসছে না—না? আচ্ছা, আমি ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

কিছু রেশম—কিছু চুল—আর একটা নরম শরীর। মুহূর্তে আমাকে নিশ্চিহ্ন করে নিল, তলিয়ে দিল কোনো তুফানের নদীতে। আর বাইরের ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে তাল-মেলানো অশ্রান্ত অসহ্য ভালোবাসার বন্যার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাচ্ছিলুম কানের কাছে চাপা স্বর: মেরী রাজা—মেরী রাজা—মেরী রাজা—

ভোরবেলা যখন উঠে বসলুম, তখনও সরস্বতীর একখানা হাত আমার গলার ওপরে এলানো।

গ্লানিতে—লজ্জায়—ক্ষোভে আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালুম। পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে রেখে দিলুম সরস্বতীর বালিশের নীচে। বৃষ্টি তখনো পড়ছে—তখনো বাইরে আবছায়া অন্ধকার—তখনো ডাল্-কি-মণ্ডীর ঘুম ভাঙেনি।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলুম আমি। পালিয়ে চললুম বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে। পাপবোধে, লজ্জায়—নিজের দুর্বলতায় দু'চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।

সেইদিনই আমি দেশে ফেরবার জন্যে ট্রেন ধরলুম।

॥ ২ ॥

মোমবাত্তিটার দিকে চোখ পড়ছে। দেখছি, এরই মধ্যে কখন অনেকগুলো পোকা এসে পুড়ে মরেছে। ওরা অমনি করেই মরে। আমি নিজেই কি তা জানি না?

আমার কোনো আত্মা আছে কিনা বলতে পারি না। যদি থাকে —ওই পোকাগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবছি—যদি থাকে, তা হলে সেটা কখন আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ওই পোকাদের সঙ্গেই হয়তো পুড়ে মরেছে। কিন্তু ওদের মধ্যে কোনটা যে আমি, সেইটেই কেবল বুঝতে পারছি না এখনো। আর আত্মাহীন অথচ জীবন্ত একটা শারীরিক সত্তা নিয়ে আমি বসে আছি এখানে। অদ্ভুত!

বাইরে শেয়াল ডাকল। আগে দূর থেকে ডাকত—কত কাছে এগিয়ে এসেছে এখন। আর ক'দিন পরে এই বাড়ির ভেতরেই ওরা জায়গা করে নেবে। আমার পূর্বপুরুষেরা কী করবে তখন? রাত জেগে শেয়াল তাড়াবে? কল্পনাটা নিজের কাছেই এমন বিকট বোধ হচ্ছে যে হাসি পাচ্ছে আমার।

কিন্তু সরস্বতী! আমার জীবনেই সেই প্রথম নারী। আমার চিরকুমার জীবনে সে-ই প্রথম বাসররাত্রি।

আজ ছত্রিশ বছর পরে যখন নিজেকে খতিয়ে দেখতে বসেছি, এখন মনে হচ্ছে—অত রাগ করবার, অত অনুতপ্ত হওয়ার প্রয়োজন ছিল না সেদিন। হয়ত সেই ঝড়ের রাতের মাতলামি সবটাই ফাঁকি ছিল না—শুধু মদের নেশাই তাকে সে রাতে অমন করে আমার কাছে টেনে আনেনি। 'মেরী রাজা—মেরী রাজা'। সেই অসহ্য

তীব্র আবেগ কি কেবল খানিকটা বন্যার জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না? হয়তো সত্যিই ও ভালোবেসেছিল আমাকে। হয়তো নানা মানুষের ভিড়ে আমিই প্রথম পুরুষ হয়ে এসেছিলুম ওর জীবনে। তাই সেই ভালোবাসার দাবিতেই সে রাত্রে ও অমন করে আমাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। যেমন করে সমুদ্রের ঢেউ এসে এক অঞ্জলি পাহাড়ী ফুলকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

ধরা যাক, আমি ওকে নিয়ে যদি ঘর বাঁধতুম? তা হলে ও আমার স্ত্রী হয়ে দেখা দিত, স্নেহ দিত, মমতা দিত, দুঃখে দুর্দিনে ক্লান্তিতে সেবা দিয়ে আমায় ধন্য করত। হয়তো নিজেকে নিয়ে এই ভাবে আমি জুয়া খেলতুম না—হয়তো চুয়ান্ন বছর বয়সে এ কথা মনে হত না যে আজ এখানকার সব প্রয়োজন আমার ফুরিয়ে গেছে।

ছ'বছর পরে আবার যখন কাশীতে যাই, তখন অলস কৌতূহলে একবার চলে গিয়েছিলুম ডাল-কি-মণ্ডিতে। সে দিন আমার মনে সে প্রতীক্ষা ছিল না—সে নেশাও ছিল না। তবু সেই চেনা গলি —দোতলার বারান্দায় সঙ্গীত-রসিক শেঠজীদের জন্যে প্রতীক্ষায় বসে থাকা সেই মেয়েরা—সেই পান জর্দা ফুলের গন্ধ, সেই তবলা-সারেঙ্গী আর কোথাও বা ঘুঙুরের আওয়াজ—মধ্যে মধ্যে ঠিকরে-আসা তীক্ষ্ণ মধুর গলায় এক আধটা গানের সুর কয়েক মুহূর্তের জন্যে বিহ্বল করে দিয়েছিল আমাকে। আমার মনে পড়ে গিয়েছিল আঠারো বছর বয়সের প্রথম যৌবনে সেই প্রথম সাকীর দেওয়া সুরার স্বাদ।

সরস্বতীর বারন্দায় আর একটি মেয়ে। মধ্যবয়সী দীপ্তোজ্জ্বলা একটি গৌরাঙ্গী। আর সেই ভদ্র সম্ভাষণ: আইয়ে শেঠজী—পা ধারিয়ে—

—সরস্বতী বাঈ?—না—তার কোনো খবর সে জানে না। সে আগ্রা থেকে মাত্র বছর দুয়েক আগে এসেছে।

কেবল এক পানওয়ালা একটুখানি হদিশ দিতে পেরেছিল।

—উতো চলি গয়ী।

—চলে গেছে।

—হ্যাঁ, গাজিয়াবাদে। সে আজ প্রায় 'ঢ়াই বরিষ' আগে। এক শেঠজী এসেছিল, সেই ওকে নিয়ে গেছে রাখবার জন্যে—ওর মা-ও গেছে সঙ্গে।—আমার মুখের দিকে একটুখানি সহানুভূতির দৃষ্টি ফেলেছিল বুড়ো, কী ভেবেছিল সে-ই জানে, যেন সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলেছিল: বাঈ লোগোঁকী কানুন এহি হ্যায় বাবুসাহেব। উ-তো চিড়িয়া-কি জাত। সোনেকা পিঁজরামে যে পুষতে পারে—চিড়িয়া তারই।

ভেবেছিলুম সরস্বতী চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে: মনে হয়েছিল—সেই রাত্রিটির পটভূমিতেই সে চিরদিনের জন্যেই স্থির হয়ে রইল। এই ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি মানুষের তরঙ্গে একটি ছোট বুদ্বুদকে আমি আর কখনও খুঁজে পাবো না। কিন্তু—

নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখছি। কড়ে আঙুলে একটি আটিং—হীরের আংটি। জীবনে অনেক দুঃখ-দুর্দিনেও এটিকে আমি বেচতে পারিনি। সেই রাতে কখন সরসতী আমারটি নিয়ে তার বদলে এটি পরিয়ে দিয়েছিল।

আমি তখন কিছুই টের পাইনি। মাথার ভেতর আগুনের চাকা ঘুরছিল, নিজেকে কী অশুচি—কী অস্পৃশ্য মনে হয়েছিল! ফিরে গিয়ে জামাকাপড়সুদ্ধুই আমি অন্ধকারমাখা শীতল গঙ্গায় স্নান করেছিলুম, লুটিয়ে প্রণাম করেছিলুম বিশ্বনাথের মন্দিরে—তারপর ধর্মশালায় পৌঁছে সারাটা দিন মুখ গুঁজে পড়ে থেকেছিলুম। সেখান থেকে বেরিয়ে ট্রেনে না ওঠা পর্যন্ত—নিজের দিকে যেন তাকিয়েও দেখতে পারিনি। সেই বায়স্কোপ দেখে প্রণব অমন করে কেঁদেছিল কেন—তা যেন তখন আমি বুঝতে পারলুম, তখনই অনেক কিছুর অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল।

আংটিটার ওপর নজর পড়ল মোগলসরাইতে এসে। মনে হয়েছিল, ছুড়ে ফেলে দিই। পারিনি। তারপর থেকে ও আমার ছত্রিশ বছরের সঙ্গী। দিনের পর দিন ওটার ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে—আজ আমার শরীরের অংশ হয়ে গেছে ওটা।

এইবার আমি ওটাকে বেচে দিতে পারি। বলতে গেলে ওইটেই আমার শেষ ভরসা।

শুনেছি হীরের দাম এখন অনেক। হয়তো হাজার খানেক টাকা দাম দিতে পারে এখন। এখান থেকে কলকাতায় গিয়েই আমি ওটাকে বিক্রি করব। তারপর বাকী জীবনটুকুর জন্যে ও-ই আমার পাথেয়।

কিন্তু সর্‌সতীকে আমি হারাইনি। আরো কয়েকবার দেখা হয়েছে। তখন সে কাছে এসেও অনেক দূরের। তখন আরো দশজন ক্ষণিকের অতিথির মতোই একটুখানি পরিচয়ের সৌজন্য। আমিও তো কোনো দাবি তুলিনি—সে রাতের কথা একটিবারের জন্যেও মনে করিয়ে দিইনি ওকে। অমন কত আসে—কত যায়! এমনকি এ কথাও আমার মনে হয়নি যে আঙুলে তারই দেওয়া সেই আংটিটি রয়েছে—সে-ও তো আংটিটাকে চিনতে পারেনি।

সর্‌সতীর কথা এখন থাক।

দেশে যখন ফিরে এলুম—তখন লজ্জায় মার মুখের দিকে ক'দিন আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখতে পারিনি পর্যন্ত। গয়ার পুণ্য-ভূমিতে পিতৃকৃত্য করতে গিয়ে—কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শন করতে গিয়ে—এ কিসের বোঝা মাথায় করে ফিরে এলুম আমি! এত বড় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমি কেমন করে করব!

প্রাণপণে আমি কাশীর দিনগুলোকে মুছে দিতে চাইলুম। বাবা কাকা—তারও আগে ঠাকুর্দারা যেমন করে সেরেস্তায় বসতেন, আমিও তেমনি ভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করবার ভার নিলুম।

ঠিক সকাল সাতটায় গিয়ে সেরেস্তার মাঝখানটিতে গিয়ে বসতুম, ফিরতুম বেলা বারোটায়। প্রজারা আসত—লোকজন যাতায়াত করত—নজর নজর দিয়ে যেত সময় সময়। সন্ধ্যেবেলায় দেওয়ান এসে আমার ঘরে কাগজপত্র দিয়ে যেতেন—অনেক রাত পর্যন্ত হিসেবপত্র দেখাশোনা করতুম।

কর্মচারীরা বলত: হ্যাঁ, নিমুবাবুই সত্যিকারের জমিদারের ছেলে। এমনি না হলে কি আর বিষয় সম্পত্তি রাখা যায়!

মহালেও যেতুম কখনো কখনো। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হত। এত পাপ—এত অত্যাচার সয়েও কী শ্রদ্ধা প্রজাদের—কী তাদের ভালোবাসা! দিনের পর দিন যাদের ভিটেমাটি উচ্ছেদ করে ঘুঘু চরাই—তাদের ভক্তির সেকি উচ্ছ্বাস! অথবা ভক্তি ভালোবাসা ও-সব কিছুই নয়—শুধু আতঙ্ক—শুধু সংস্কার—কেবল অভ্যাস। যে অভ্যাসে মানুষ সত্যনারায়ণের পুজো করে, যে অভ্যাসে পথে-ঘাটে ঠাকুর দেবতার থান দেখলেই মানুষের মাথা নিচু হয়ে আসে—এ সব তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু সেই বয়সে এত তত্ত্বকথা মাথায় আসত না। নতুন জমিদার হওয়ার মোহে—একটি নিতান্ত ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র থেকে রাতারাতি সিংহাসনে বসার উত্তেজনায় আমি তখনকার মতো আশ্চর্য আত্মতৃপ্ত ছিলুম। মনে হয়েছিল এমনি করে দিনগুলো যদি কেটে যায় তো—যাক; জমিদারী করে, দোল দুর্গোৎসবের ভেতর দিয়ে পিতৃ-পুরুষের পথ ধরেই আমি নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চলি।

কখনো কখনো যে চঞ্চলতা একেবারে জাগত না—তাও নয়।

আমাদের পলাশডাঙ্গার কাছারীতে গেলে আমার ভালো লাগত। অদ্ভুত সুন্দর জায়গাটি। একটি উঁচু টিলার ওপর কাছারী-বাড়ি, তার সামনে নবাবী আমলের পুরানো দীঘির অবশেষ—এখন কেবল অঢেল পদ্মবন। সেই দীঘির ওপারে মাঠ ধূ ধূ করছে—যতদূর

চোখ যায় দুটো চারটে তাল আর বাবলা গাছ সেই শূন্য মাঠটাকে যেন আরো শ্রীহীন রিক্ত করে রেখেছে। নির্জন দুপুরবেলায় দুজন পেয়াদা গুনগুন করে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ত, ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে শুকনো হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত যেন পদ্মদীঘিতে স্নান করতে—তারপর সেই সদ্যোস্নানের গন্ধ নিয়ে যেন আমার মুখের ওপর কোনো রেশমী শাড়ি কিংবা ওড়নার ছোঁয়া বুলিয়ে যেত। আর আমার মনে পড়ত, ডাল-কি-মণ্ডীর সেই দ্বিতীয় সন্ধ্যাটিকে—সবে স্নান করে—সারা শরীরে গোলাপী শাড়ির মোহ জড়িয়ে ঘরে এসে পা দিয়েছিল সরস্বতী।

আমি তখন কড়ে আঙুলের হীরের আংটিটার দিকে তাকিয়ে দেখতুম। নখদর্পণের মতো কিছু একটা খুঁজতে চাইতুম ওর ভেতরে। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসার কোন জবাব মিলত না।

তবু দিন কাটছিল। থিয়েটারের কথাও আর আমি ভাবি না। গ্রামে বা আশেপাশে কোথায় থিয়েটার হচ্ছে শুনলেই যেন কেমন একটা শীতল আতঙ্ক উঠে আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত। মনে হত, ওই থিয়েটারের জন্যেই সব। ওরই সর্বনাশা নেশায় অমন করে কলেজ থেকে আমাকে বিদায় নিতে হল, ওরই জন্যেই বুঝি অমন আকস্মিক অপঘাতে বাবা আর কাকাকে আমি হারালুম, আর তারপর কাশীতে গিয়ে—

আত্মগ্লানি আর আত্মসংশোধনের মধ্য দিয়ে আমার দুটো বছর পার হল দেখতে দেখতে। কিন্তু আমি তো জানতুম না।—গ্রীনরুমের সেই মায়া-মুকুরের ভেতর দিয়ে কখন আমার জন্যে পথ তৈরি করে রেখেছে আমার ভাগ্য—প্রতিদিনের ব্যবহারে এত বেশী চেনা এই জীবনের মধ্যে আমার শান্তি কোথায়—আমার মুক্তি কই ? যে সত্য অথচ সত্য নয়—যা জীবন না হয়ে জীবনের সুরারূপে

মানুষকে মাতাল করে—তার হাত এড়িয়ে যাব—এমন শক্তি কোথায় আছে আমার ?

বিনু তখন ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতার কলেজে পড়ছিল। আমি জানি, কলেজে আমি কী করেছিলুম—কিভাবে ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সে সব খবর বিনুর একেবারেই অগোচর ছিল না। কিন্তু একটি দিনের জন্যেও ও কখনো তার আভাস দেয়নি। আজ বুঝতে পারি, সব ও সঞ্চয় করে রাখছিল। যেদিন যাত্রার অভিনয়ে ওকে রাজা সুরথের পার্ট দিইনি, যেদিন রোহিতাশ্বের পার্ট করে আমি মেডেল পেয়েছিলুম—সেদিন থেকেই ও অপেক্ষা করে আছে সময় এলেই সুদে আসলে মিটিয়ে নেবে।

যাই হোক, কলকাতা থেকে খবর এল, বিনু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মা আর কাকীমার কান্নাকাটিতে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হল যে সেই দিনই বেরিয়ে পড়তে হল আমাকে।

কলকাতার কথাতেই মনের মধ্যে ঢেউ উঠতে শুরু করেছিল। চোখের সামনে দেখা দিচ্ছিল বিকেলের পড়ন্ত আলো, দেবদারু গাছটা থেকে লাল-নীল বড়ো বড়ো হরফে আধখানা খুলে যাওয়া সেই পোস্টারটার হাতছানি ; তড়িৎ—প্রণব—সেই ল্যাণ্ডো গাড়ী—সেই অর্কেস্ট্রা—

না—এরপর থেকে আমি চোখ বুজে চলব কলকাতার পথ দিয়ে। দরকার হলে কালীঘাটে যাব, বেলুড় মঠে গিয়ে হাজির হবো, কিংবা সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে বক্তৃতা শুনতে যাব। যে ভুল একবার আমি করেছি—আর পা দেব না তার ভেতরে।

ভুল ?

এখন ভাবছি কোনো ভুল করিনি। থিয়েটারকে আমি ভালোবেসেছিলুম—আমি শিল্পী হতে চেয়েছিলুম। তার মধ্যে পাপ ছিল না—অপরাধও ছিল না। কেবল দায় ছিল সেই পরিবেশের

—যা প্রতি মুহূর্তে পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিতে চেষ্টা করে।
—যা আলো আর আলেয়ার মধ্যে বিভ্রম ঘটিয়ে দেয়।

হ্যাঁ—সেই কথাতেই আসছি।

কলকাতায় এসে দেখলাম, বিনু অনেকটা ভালো। খুব সম্ভব ম্যালেরিয়াতেই তার হাই টেম্পারেচার উঠেছিল, ভুল বকেছিল। আমি যেদিন গেলুম সেদিন তার জ্বর অনেকখানি নেমে গেছে, পরের দিন একেবারেই ছেড়ে গেল।

বিনু আলাদা ধরনের ছেলে। হস্টেল-বোর্ডিংয়ে সে ওঠেনি। পনের টাকা দিয়ে একেবারে কলেজ স্ট্রীটের ওপর একটা মেসের তেতলায় সিঙ্গল সিটের ঘর ভাড়া নিয়েছে। কোনো গণ্ডগোল নেই, কারর সঙ্গে তার গায়ে গায়ে লাগে না—বিদ্যা-চর্চার আদর্শ পরিবেশ গড়ে নিয়েছে সে। বি-এ পাশ করে সে ওকালতী পড়বে—এই তার একমাত্র স্বপ্ন।

ছাত্র হিসাবে ওর চাইতে ঢের ভালো ছিলুম আমি; ও একটা মাত্র লেটার পেয়েছে—আমি পেয়েছিলুম চারটে। ওর ঘরের শেলফে সারি সারি বই দেখে আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

বিনু আধশোয়া ভাবে কমলা নেবু খাচ্ছিল। হঠাৎ বললে, তুমিও কলকাতায় চলে এসো না নিমুদা, একসঙ্গে পড়াশোনা করি দুজনে।

আমার বুকের ভেতর ধক্ করে উঠল। শুকনো হাসি হেসে বললুম, না—সে আর হয় না।

—কেন হয় না? এমন ব্রিলিয়ান্ট্ ছাত্র তুমি! তুমি পড়া ছেড়ে দেবে ভাবাই যায় না।

—আমি পড়তে আসব—দেশের বিষয়-সম্পত্তি দেখবে কে?

—চিরকাল যারা দেখে আসছে। ওই দেওয়ানজী—ওই নায়েব-মশাই। তুমি কি ভাবো—বাবা আর জ্যাঠা-মশাইও কিছু

দেখতেন ? গিয়ে সেরেস্তায় বসতেন কেবল। তখনও যা হত, এখনো তাই হয়। যারা চুরি করত, তারা এখনো করে। তুমি রাত জেগে যতই হিসেব দেখো আর যতই মহালে যাও—সব সেই এক রকম।

—বাড়িতেও তো কারুর থাকা দরকার।—তারপর শুকনো হাসি হেসে জবাব দিলুম : আচ্ছা, তুই আগে ল'টা পাশ করে নে, তখন না হয় আমি নতুন ভাবে আরম্ভ করব।

বললুম বটে, কিন্তু মনে কেমন একটা ভার জমে রইল। দুদিন বিনুর কাছ ছাড়িনি—আজ একটুখানি বেড়াবার জন্যে বেরিয়ে পড়লুম। ভাবলুম চলে যাই গঙ্গার ধারে—আউটরাম ঘাট ছাড়িয়ে কেল্লার পাশে কোনো নির্জন জায়গায় খানিকটা ঘাসের ওপরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকি।

সেই সংকল্প নিয়েই হাঁটতে হাঁটতে চলে এলুম কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। এখান থেকেই ট্রাম ধরব।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার চোখ পড়ল সামনের বাড়িগুলোর দিকে।

কে ভেবেছিল আজ শনিবার ? আমি কলকাতার মানুষ নই—সপ্তাহের প্রতিটি দিনের হিসেব আমাকে করতে হয় না—শনিবারের ছুটির জন্যে ব্যাকুল প্রতীক্ষা আমার মনের কোথাও নেই। কিন্তু সেই লাল-নীল হরফ, সেই পোস্টার এক মুহূর্তে আমাকে জাগিয়ে দিলে।

'অদ্য সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়—কর্ণার্জুন। শ্রেষ্ঠাংশে— '

তৎক্ষণাৎ আমি যেন পাথর হয়ে গেলুম।

আমার সামনে দিয়ে হাইকোর্টের দিকে ফাঁকা ট্রামগুলো চলে যেতে লাগল। একখানা দু'খানা-তিনখানা। সবে সিগারেট খেতে শিখেছি, তার দুটো টেনে নিলুম পর পর, ঠোঁট আর গলা জ্বালা

করতে লাগল। তবু আমি নড়তে পারলুম না ওখান থেকে। ওই পোস্টারগুলো আমাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে।

একবার ভাবলুম—পালাই, বিনুর সেই তেতলার ঘরটিতে গিয়ে মুখ লুকিয়ে বসে থাকি। কিন্তু তারপর একটা প্রবল ইচ্ছা, একটা তীব্র উগ্র আকাঙ্ক্ষার আবেগ ধীরে ধীরে পেয়ে বসতে লাগল আমাকে। নিজের সমস্ত পাপবোধের ভাষা ঠেলে দিয়ে উঠে আসতে লাগল: যুক্তি।

আজ আর কিসের ভয়? কুড়ি বছরের সাবালক আমি, নিজের জমিদারীর মালিক। এখন ট্রামে যেতে যেতে সেই সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের মুখের ওপরে আমি স্বচ্ছন্দে সিগারেটের ধোঁয়া ছড়িয়ে দিতে পারি, প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে পথে দেখা হলে তাঁর কাঁধের ওপর হাত রেখে অন্তরঙ্গতার সুরে বলতে পারি, চলুন না স্যার আমার সঙ্গে, আমি আপনাকে বক্সে বসিয়ে থিয়েটার দেখাব এখন। অনেক টাকা আছে আমার পকেটে, আপনার এক মাসের মাইনে আমি এক দিনেই খরচ করতে পারি।

অন্যায়?

কিসের অন্যায়? মানুষে দেখবে বলেই তো থিয়েটার, তাকে আকৃষ্ট করবার জন্যেই তো এত পোস্টার আর হ্যাণ্ডবিলের ছড়াছড়ি তার সারাটা সপ্তাহের ক্লান্তি আর একঘেয়েমি দূর করে দেবে বলেই তো নাটকের এত মহলা, এত আলো, এত বাজনা, এমন প্রাণকাড়া অভিনয়। কেন খানিকটা কাল্পনিক অপরাধে সংকুচিত করে সেই আনন্দের জগৎ থেকে আমি নির্বাসিত করে রাখছি?

বাবার পকেট-ঘড়িটা মা আমায় দিয়েছিলেন—স্মৃতি হিসেবে। তাকিয়ে দেখলুম, সাড়ে ছ'টা।

আবার একটা হাইকোর্টের ট্রাম বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে। কিন্তু গঙ্গার ধারে একটা শান্ত ছায়ায় ঘাসের ওপর চুপ করে বসে

থাকবার প্রৌঢ় ভাবনা তখন নিঃশেষে মুছে গেছে আমার। আমাকে ডাক দিয়েছে সেই কলকাতা—চিৎপুর রোডের দু-ধারে সন্ধ্যার পরে দাঁড়িয়ে থাকা দেহপশারিনীর মতো, ডাল্‌-কি-মণ্ডির গলিতে বারান্দায় বসে থাকা বাঈজীদের মতো—বেলা ডুবে গেলে আর সারি দিয়ে গ্যাস-ইলেকট্রিক জ্বেলে উঠলে চোখের পলকে যে মোহিনী যৌবনবতী হয়ে ওঠে।

মন স্থির হয়ে গেল আমার। আমি রাস্তা পেরিয়ে আবার ফিরে এলুম বিনুর মেসে।

বিনু বললে, এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে নিমুদা?

আমি বললুম, থিয়েটারে যাচ্ছি। ফিরতে দেরী হবে। আমার জন্যে ভাবিসনি।

বিনুর চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল একবার—কী একটা বলতে চাইল যেন মনে হল। কিন্তু আমি আর সময় দিতে পারি না। কখন—কোন্‌ মুহূর্তে আবার দুর্বল হয়ে পড়ব কে জানে।

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, তুই তো আজ ভালোই আছিস। একটু সাবধানে থাকিস। আচ্ছা—আমি চললুম।

বেরিয়েই আমি ধরলুম শ্যামবাজারের ট্রাম।

তারপর ঃ

তারপর সেই আলো জ্বলল, বাজনা বাজল, ড্রপ উঠল। মায়া-মুকুরের ভেতর দিয়ে যে আশ্চর্য পৃথিবীর সন্ধান পাওয়া যায়, খুলে গেল সেই অমরাবতীর দরজা। আর সেই ঝড়ের রাতে সরসূতীর আলিঙ্গনের মতো আমার চারদিক ঘিরে নামতে লাগল ইন্দ্রজাল, আমি তার মধ্যে তলিয়ে গেলুম।

এবার সত্যিই বাঁধ ভাঙল।

॥ ৩ ॥

নাঃ—এক গ্লাস জল খাওয়া যাক। কখন যে তৃষ্ণায় গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে টেরই পাইনি।

জানালার বাইরে দিয়ে কে গেল? কিসের শব্দ হচ্ছে বাইরে? কারা এসেছে আমার ঘরের ভেতর?

কেউ নয়—কিছু নয়। বাদুড় চামচিকে উড়ে বেড়াচ্ছে—হাওয়ায় আমার কাপড়-জামা নড়ছে হয়তো—এই লক্ষ্মীছাড়া বাড়িতেও যারা এখনো খুদ-কুঁড়ো কুড়িয়ে পায়—সেই ইঁদুরেরাই ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে খুব সম্ভব। কেউ নেই—কিছুই নেই। যা কিছু দেখি, যা কিছু শুনি—তা আমার ব্যাধি-জর্জরিত লিভার থেকে উৎক্ষিপ্ত খানিক দুঃস্বপ্ন মাত্র।

এই বাড়িতে আমি আজ একা। এই বাড়ির শেষ আলোটিকে নিবিয়ে দিয়ে যাওয়ার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি।

মোমবাতির নীচে মৃত পোকার স্তূপ জমেছে। খানিকটা গলানো মোম বয়ে চলেছে টেবিল বেয়ে। একটা অন্য উপমা মনে আসছে আমার। এই পরিবারের শেষ শিখার মতো মোমবাতির আলোটা তো আমিই। সেই প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা থেকে শুরু করে যত অপরাধ আমাদের জমেছিল, সব ওই পোকাগুলোর মতো পুড়িয়ে আমি নিঃশেষ করে দিলুম।

আবার চেয়ারটাতে এসে বসেছি। জানালা দিয়ে অন্ধকার উঠোনে আমার ছায়া পড়েছে; কিন্তু উঠোনটা এখন আর সম্পূর্ণ অন্ধকার নেই। এই বাড়িটার মাথার ওপর বোধ হয় এক্ষণে এক-

কাস্তি ভাঙা চাঁদ উঠেছে, খানিকটা বিষণ্ণ হাসির মতো তাই ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে।

মনে পড়ছে—'কর্ণার্জুন' দেখে ফিরে আসার কথা।

বাঁধা যখন ভাঙল—তখন একেবারেই ভাঙল। হু-হু করে বন্যার উচ্ছ্বাস ছুটে এল তারপর।

পরদিন রবিবার। আবার আমি থিয়েটারে গেলুম।

বিনু আজ আর কিছু বলেনি। একটু হেসেছিল কেবল।

—রোজ রোজ এ ভাবে রাত জাগতে কষ্ট হয় না নিমুদা?

বলেছিলুম, থিয়েটার করতে করতে আমার রাত জাগার অভ্যাস হয়ে গেছে।

বিনু বলেছিল, হুঁ—তুমি তো বরাবরই থিয়েটার পাগল।

আজ আর কোনো ক্ষোভ ছিল না—এতটুকু লজ্জাও কোথাও নয়—যেটুকু বাধা ছিল, বিনুই যেন তা সহজ আর নির্ঝঞ্ঝাট করে দিলে।

পরের সপ্তাহে আমি বাড়ি ফিরে এলুম।

কিন্তু মনের ভেতর তখন অন্য সুর বাজতে শুরু হয়েছে। আর কিছুতেই নিজেকে মেলাতে পারছি না সেরেস্তার খাতায়, হিসেব-নিকেশ, লাটের কিস্তিতে। এমন কি পলাশডাঙার কাছারীতে গিয়ে মাঠের ভেতর থেকে বয়ে-আসা পদ্মের গন্ধমাখা সে বাতাস আমার অসহ্য বোধ হয়। কলকাতার রূপসী থিয়েটার সরস্বতীর মাদকতা নিয়ে আমার দিকে দুহাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

একমাস না যেতেই আমার অসহ্য হয়ে উঠল। মনে হল, এভাবে আরো কিছু দিন পড়ে থাকলে আমি মরে যাব—আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

মা-কে এসে বললুম, মা আমি কলকাতা যাব।

মা চমকে উঠে বললেন, কেনরে—বিনুর আবার অসুখ করল নাকি?

—না—না, সে সব কিছু নয়। সে ভালোই আছে।

—তবে যেতে চাইছিস কেন?

—ভারী একঘেয়ে লাগছে। জমিদারীর কচকচিতে বিরক্ত হয়ে গেছি। বেড়িয়ে আসব দিন কয়েকের জন্যে।

মা একটু চুপ করে রইলেন—যেন অকারণে কলকাতা যাওয়ার প্রস্তাবটা তাঁর খুব ভালো লাগল না। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তবে যা। কিন্তু এখানকার তো সবই জানিস—বেশি দেরী করিস না।

দেরী করব না প্রতিশ্রুতি দিয়েই এলুম। কিন্তু বিনুর মেসে আমি আর গেলুম না এবার। সোজা এসে শেয়ালদার একটা বড়ো হোটেলে আস্তানা নিলুম।

বিকেলে বিনু এসে বলল, এখানে কেন নিমুদা? আমার মেসে চলো।

—না-না—কিছু দরকার নেই। আমি দু চার দিনের জন্যে এসেছি, ইচ্ছামতো ঘোরাফেরা করে চলে যাব। তোর ওখানে গিয়ে উঠলে মিছিমিছি পড়াশোনার ক্ষতি করা হয়।

বিনু একটা কিছু বুঝে নিলে। এখন মনে হয়—ও আমাকে ঠিকই চিনে নিয়েছিল। সুযোগের অপেক্ষা করছিল কেবল।

—আচ্ছা, কাল তবে আবার খবর নেব—বলে বিনু চলে গেল।

শেয়ালদার হোটেলে উঠেছিলুম বিনুর পড়ার ক্ষতি বাঁচাতে নয়। আমার ইচ্ছামতো চলাফেরায় এতটুকু বাধা রাখতে চাই না। হোটেলে থাকলে নিরঙ্কুশ।

থিয়েটার দেখে ফিরে এলুম দেশে। কিন্তু সমস্ত মনটাকে ফেলে এলুম পেছনে।

কিছুদিন পরে আবার, তারপরে আবার। শেষ আর কোথাও কোনো আড়াল রইল না। থিয়েটার না দেখে আমি থাকতে পারি

না। একই নাটক বার বার দেখি। শুধু দেখাই নয়—তার সঙ্গে কল্পনা করি, আমিও অভিনয়ে নেমে পড়েছি। সবচেয়ে দামী আসনে বসে অভিনয় দেখতে দেখতে কখন আমি অভিনেতাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই; মনে হয় শরীরটা দর্শকদের মধ্যে পড়ে থাকলেও আমার আত্মা আমাকে ছাড়িয়ে অভিনেতাদের মধ্যে চলে গেছে, আমি ওদেরই একজন।

মুগ্ধতার পালা কাটিয়ে এখন সমালোচনা জাগে কখনো কখনো। অনুভব করি, যেমনটি আশা করেছিলুম, তা যেন হচ্ছে না। আমি যদি ওখানে ওই চরিত্রে নামতে পারতুম—তা হলে ঢের বেশি ভালো করতে পারতুম।

কিন্তু বাড়িতে তখন একটা সন্দেহের ঢেউ উঠেছে। আমার কলকাতা যাওয়ার মাতলামি একটা অন্য অর্থ নিয়ে চাপা গুঞ্জন ছড়িয়েছে বাড়িময়। আমার থিয়েটারে আনাগোনার খবরও গোপন নেই। খুব সম্ভব, বিনুও কিছু লিখে পাঠিয়েছিল, কিন্তু সে-কথাটা তখন আমার মনে হয়নি।

শেষে মা-ই আমাকে ডাকলেন একদিন।

—তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে নিমু।

ভেবেছিলুম জমিদারী সংক্রান্ত কিছু হবে। বললুম, বলো।

কথা শুরু করবার আগে মা-র ঠোঁট দুটো বার কয়েক নড়ল—যেন নিজের মধ্যে তৈরী হয়ে নিলেন। তারপর শান্ত মৃদু গলায় বললেন, আজ দু'আড়াই বছর ধরে লক্ষ্য করেছি, কিন্তু কথাটা বলেও বলিনি। তোমার হাতে সেই পৈতের আংটিটা কোথায় গেল?

একবারের জন্য আমার চোখ-মুখ ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল, বুঝতে পারলুম আমার গাল-কপালের রং একেবারে বদলে গেছে। ডাল-কি-মণ্ডির সেই রাতটা আমার চোখের সামনে দিয়ে ঘূর্ণির মতো ঘুরে গেল।

আমি বললুম, সেটা কথা হত, তুলে রেখেছি।

—তাই কড়ে আঙুলের ওই ছোট আংটিটা কিনেছ বুঝি?—আরো শান্ত শোনালো মার গলা।

—হ্যাঁ, তাই কিনেছি।

—ও। তা কড়ে আঙুলের জন্য আংটি কিনলে কেন? তা ছাড়া ও-রকম আংটি তো মেয়েরাই পরে।

আশ্চর্য চোখ। আর আমি ভাবতুম বাবার মৃত্যুর পরে পুজো-আচ্চা আর গীতা-পাঠ নিয়েই বুঝি মা-র সময় কাটে, এ-সব তুচ্ছ জিনিস তাঁর নজরেও আসে না।

আমি বিবর্ণ হয়ে বললুম, পছন্দ হয়েছিল তাই কিনেছি। অত ভেবে দেখেনি।

মা-র কপালে রেখা দেখা দিলে কয়েক মুহূর্তের জন্যে—ঠোঁট দুটো চেপে বসল একবার। মা আংটির প্রসঙ্গটা আর তুললেন না। তার বদলে বললেন, আমাদের ইচ্ছা তোমার বিয়ে দিই।

—বিয়ে! এখুনি কেন?

—একুশ বছর তোমার বয়েস—তোমার বাবা-ঠাকুরদার অনেক কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল।

আমি জবাব দিলুম, সেদিন এখন আর নেই। বিয়ে আমি করব না।

হঠাৎ মার স্বর তীব্র হয়ে উঠল। চকিতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল এতক্ষণ ধরে বহু কষ্টে ধরে থাকা ধৈর্যের মুখোসটা—চোখ ঝকঝক্ করে উঠল। হাতে মালা ছিল জপের, ঠক করে সেটাকে পাথরের বাটিটার মধ্যে নামিয়ে রাখলেন।

মা বললেন, তবে কী করবে? মাসে মাসে কলকাতায় যাবে আর থিয়েটারের নচ্ছার মেয়েদের নিয়ে বখামো করবে?

আমি তীরের মতো উঠে দাঁড়ালুম। বললুম, মা!

মা তেমনি কঠিন শাণিত গলায় বললেন, চোখ রাঙাচ্ছ কাকে? তোমার বাবাকেও কোন দিন ভয় পাইনি—তেমনি বাড়ির মেয়ে তুমি আমায় পাওনি।

—চোখ আমি রাঙাইনি। কে রটিয়েছে এই এ-সব কথা তাই জানতে চাই।

মা বললেন, কে আবার রটাবে? তোমার নিজের বুদ্ধি-শুদ্ধি নয় বিগড়ে গেছে—তাই বলে দুনিয়াশুদ্ধ্ লোকের চোখও অন্ধ হয়ে গেছে? কেন তোমাকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, শেষ রাতে, হস্টেলের জলের পাইপ বেয়ে তুমি কেন উঠেছিলে? কলকাতায় গিয়ে কেন তুমি বিনুর কাছে ওঠো না—হোটেলে গিয়ে থাকো? শনি-রবিবারে তুমি কোথায় যাও—কী করো?

সব কথারই জবাব দেওয়া যেত। বলতে পারতুম—কিছু নয় মা, কিছু নয়। ও কেবল থিয়েটারের নেশা। বলতে পারতুম—সর্‌সতীকে দেখে আমার চোখে রঙ ধরেছিল বটে কিন্তু ওই আংটিটার জন্যে কোন অপরাধ ছিল না। কিন্তু মাথায় তখন রক্ত ছুটছিল। বললুম যা করেছি, বেশ করেছি। নিজের ভালোমন্দ আমি বুঝি।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি, বংশের ধারাই তুমি ধরেছে। ভেবেছিলুম, এতদিন পরে তুমি হয়তো মানুষ হবে—বিদ্যায় বুদ্ধিতে নিজে বড়ো হবে, সংসারকে বড়ো করে তুলবে। কিন্তু সবাই চলেছ একই রাস্তায়। তোমার বাপ-ঠাকুর্দার তবু চক্ষুলজ্জা ছিল—যা কিছু নষ্টামো করত মহালে গিয়ে। তোমার মতো তারা এমন করে কলকাতায় গিয়ে নাম বাজাত না।

আমার সারা শরীর কাঁপছিল। বললুম, আর কিছু বলবে?

—শুধ্ শেষবার জিজ্ঞেস করব একটা কথা। তুমি বিয়ে করবে কি না?

—করবো না।

—তা হলে সরে যাও আমার সামনে থেকে। আর কখনো এসো না।

মা-র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম বারান্দার রেংলি ধরে। মনের ভেতরটা যখন আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল, তখন কোথা যেন একটা মুক্তির আনন্দ অনুভব করলুম—বোধ হল, সর্বাঙ্গ থেকে কতগুলো শেকল আমার ভেঙে ঝরে পড়ল। এতদিন ভেবেছি, এই সংসারের আমি বড়ো ছেলে—আমার কর্তব্য আছে সকলের ওপর, আমার মাথায় অনেক দায়িত্ব। এখন দেখতে পেলুম, চারিদিকের সবাই সে দায়িত্ব ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়েছে, কখন আমাকে ভিড়িয়ে দিয়েছে বাতিলের দলে। আর আমার কোনো সংকোচ নেই, কোথাও এতটুকু কুণ্ঠা নেই। আমি ছুটি পেয়ে গেছি।

ধীরে ধীরে নেমে এলুম সেরেস্তায়।

দেওয়ানজী বললেন, ভালোই হল নিমু, তুমি এসেছ। এই জলকরটার কাগজগুলোয় একটা সই করে দাও।

আমি বললাম, পারব না।

—পারবে না! সে কি কথা!

আমি জবাব দিলুম: আমাদের এজমালী সম্পত্তি। বিনু পরশু আসছে এখানে গরমের ছুটিতে—তাকে দিয়েই যা কিছু দরকারী সই করিয়ে নেবেন। তার আঠারো বছর বয়েস হয়ে গেছে। আমি আর এ সবের মধ্যে নেই।

দেওয়ানজী হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন কেবল।

আমি বললুম, তা ছাড়া তিনশো টাকা আমায় দেবেন। আমি আজকেই কলকাতা যাব।

—মাত্র চারদিন আগেই তো কলকাতা থেকে ফিরলে। এখুনি আবার—

বাবার চাইতেও বয়েসে বড়ো দেওয়ানজীকে এই প্রথম রুক্ষ ভাষায় আমি সম্ভাষণ করলুম।

—আমার কাজের কৈফিয়ৎ আমি আপনাকে দেবো না। তিনশো টাকা আমার চাই।

দেওয়ানজীর মুখ কালো হয়ে গেল।

—কিন্তু পরশু যে কিস্তির টাকা পাঠাতে হবে।

আমি দাঁতে দাঁতে ঘষে বললুম, চুলোয় যাক কিস্তি।

আমি কলকাতায় চলে এলুম। প্রত্যেকবার আসবার সময় মা-কে প্রণাম করে আসি। এবার সে প্রয়োজন ছিল না, অধিকারও নয়। এই বাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক আমি মেটাতে চলেছি—কোনো বন্ধনই আর রাখব না।

মনে আছে—সেদিনও শনিবার!

আজ ভাবছি, যেদিন হরিশচন্দ্র অভিনয়ে রোহিতাশ্বের ভূমিকায় নেমেছিলুম, সে দিনটাও শনিবার ছিল কিনা। পুরোনো পাঁজীর পাতা ঘাঁটলে হয়তো তার হদিশ মিলত। কিন্তু মনের সেই বিশ্বাসটাকে ভেঙে দিতে চাইনি বলেই সে খোঁজ আমি কোনদিন করিনি। আমি জানি,—সেও নিশ্চয় শনিবার ছিল, নইলে আমার ওপরে এমন ভাবে শনিগ্রহ এসে ভিড়ল কী করে?

আমি থিয়েটারে গেলুম—কিন্তু অভিনয় দেখবার জন্যে নয়। সোজা গিয়ে কাউণ্টারের একজন কর্মচারীকে বললুম, মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—কী দরকার?

—তাঁকেই বলব।

—তিনি আজ আসেন নি।

—তবে বাড়ির ঠিকানা দিন। আজই আমি যাব তাঁর কাছে।

কর্মচারীটি হাসলেন, বেশ অর্থভরা হাসি। বললেন, এখন তাঁকে বাড়িতেও পাবেন না। যেখানে তিনি আছেন—একটু সামলে নিয়ে বললেন, বরং কাল বাড়িতেই দেখা করবেন সকাল ন'টা নাগাদ।—বাগবাজার স্ট্রীটের একটা নম্বর দিয়ে বললেন : এই তাঁর ঠিকানা।

সমস্ত রাত হোটেলে আমি জেগে কাটালুম। বার বার নিজের উত্তপ্ত উত্তেজিত মস্তিষ্ককে শাসন করে বলতে লাগলুম—না, আর আমি পিছিয়ে পড়ব না। আমার লক্ষ্য আমি ঠিক করেছি—বেছে নিয়েছি আমার পথ। মিথ্যেই জোর করে এতদিন ঠেকিয়ে রেখে-ছিলুম নিজেকে—তুফানের সামনে গড়তে চেয়েছিলুম অর্থহীন একটা বালির বাঁধ। আমি যা তাই আমায় হতে হবে—নিজেকে ছাড়িয়ে আর কিছু হতে যাওয়ার সাধ্য আমার কোনোমতেই নেই।

পরের দিন যথাস্থানে পৌঁছে গেলুম ঠিক সময়েই। ন'টা বাজতে না বাজতেই।

চিনতে বেশি অসুবিধে হল না। বনেদী আমলের পুরানো বাড়ি—এক সময়ে খুব জম-জমাট ছিল মনে হয়। কিন্তু এখন পড়ন্ত অবস্থা—বোঝা যায়। লক্ষ্মী বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে রয়েছেন। অনেক দিন রঙের পোঁচ্ পড়েনি—দেওয়ালে ফাটল ধরেছে, একটি ছোট অশথের চারা মাথা নাড়ছে তেতলার ছাদের ওপর।

নীচের বসবার ঘরেই ছিলেন সুরপতিবাবু। দরজার সামনে দাঁড়াতে জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই?

—একটু কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

—আসুন ভেতরে।

সেই ঘরটাকে এখনো আমি ছবির মতো দেখতে পাই—তার কোনো খুঁটিনাটি জিনিস পর্যন্ত আমি ভুলিনি। প্রত্যেকটি দরজা-

জানালার মাথার ওপরে অর্ধচন্দ্রাকার জায়গাটি লাল নীল কাচ দিয়ে সাজানো—সকালের রোদে ঘরের ভেতরে একটা অপূর্ব রঙিন ছায়া ছড়িয়েছে তারা। যেন সারা ঘরটাই কোন থিয়েটারের স্টেজের মত মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। দেওয়ালে নানা ধরনের ছবি—দিল্লী দরবার, কয়েকটি স্বল্পাবরণা বিদেশী মেয়ের মাংসল উপস্থাপনা তা ছাড়া অনেকগুলো বড়ো বড়ো সাইজের ফটোগ্রাফ—বিভিন্ন নাটকের অভিনয় থেকে তোলা। একটা ঘড়ি টকটক করে চলছে। মেজেতে ফরাস পাতা—তাতে কয়েকটি তাকিয়া ছড়ানো—একটিতে ঠেসান দিয়ে সুরপতিবাবু বসে।

মুহূর্তের জন্যে মনে হল যেন আমি কাশীর সেই ঘরখানাকে দেখতে পাচ্ছি—যেন সরস্বতীর সেই ঘরখানা। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিলুম—নমস্কার করে বসে পড়লুম সুরপতিবাবুর সামনে।

মোটা গম্ভীর গলায় সুরপতি বললেন, কী চাই ?

নমস্কার করে বললুম, বিশেষ একটু কথা ছিল।

—বলুন।—একটা ছোট আর অলস প্রতি-নমস্কার এল।

—আমার নাম নির্মলকান্তি রায়চৌধুরী।

—বেশ—বলে যান।

লক্ষ্য করলুম, ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে। গোলগাল চেহারার মানুষ, মাথায় কাঁচা-পাকা মেশানো পাতলা চুল। রং এক সময়ে উজ্জ্বল গৌর ছিল, এখন একটা মলিনতার ছায়া। চোখ লাল—স্বর একটু আড়ষ্ট, একটু ঝিমধরা। বুঝতে পারলুম শনিবারে রাতটা ভালোই কেটেছে কোথাও—এখনো ওঁর খোয়াড়ি ভাঙেনি।

—আমি অভিনয় করতে চাই। সুযোগ দিতে হবে।

ঝিমধরা চোখ দুটো একটু খুলে গেল এবার। নড়ে বসলেন একধারে। ঠোঁটের কোণায় যেন অবজ্ঞার একটা বাঁক ফুটল মনে

হল। অর্থাৎ সেই পুরোনো আবদার। কেন যে এরা জ্বালাতে আসে!

বললেন, কখনো করেছেন অভিনয়?

—করেছি। পাড়াগাঁয়ে। নিজের বাড়িতেই স্টেজ আছে আমাদের।

—পাড়াগাঁয়ে অভিনয় সকলেই করে থাকে, কিন্তু কলকাতার সঙ্গে তার আকাশ-পাতাল তফাৎ।—ঠোঁটের কোণায় সেই বাঁকটা হাসি হয়ে উঠতে যাচ্ছিল, হঠাৎ থমকে গেল: বাড়িতেই স্টেজ আছে বলছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তার মানে অবস্থা বেশ ভালোই আপনাদের?—সুরপতি আবার নড়ে উঠলেন।

—ভালো কিনা জানি না—তবে লোকে জমিদার বলে বটে।

—অ—অ।—এইবার চোখ দুটো সম্পূর্ণ মেলে ধরলেন—বেশ নিরীক্ষণ করে দেখলেন আমাকে। এতক্ষণ হিমালয়ের মহিমা নিয়ে বসেছিলেন, ভাবছিলেন, যে কোনো সময়েই বলে বসতে পারেন—আচ্ছা, আসুন মশাই। কিন্তু হিমালয় যেন নাড়া খেলো একটুখানি।

—কী ধরনের পার্ট করেছেন?

দু একটা বিবরণ দিলুম। শুনে যেন একটু প্রসন্নই হলেন।

—হুঁ চেহারা আপনার ভালো। বয়েস কত?

—একুশ।

—বাচ্চা!—হাসলেন, কিন্তু দাক্ষিণ্য প্রকাশ পেল: তা হলেও বনেদী চেহারা।—যেন হাটে গোরু বাছাই করছেন এমনি ভঙ্গিতে বলে চললেন, টল ফিগার, মোটা হাড়—চোখ ভালো, শার্প ফিচার! হুঁ!

কথাগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যে এ অবিনয় আমি করতে চাই না। কিন্তু সেদিন—সেই তখনও এই সামান্য সত্যটুকু বুঝতে আমার বাকী থাকেনি যে জমিদারীর ওই পটভূমিটি না থাকলে আমার চেহারায় যে এত ভালো ভালো জিনিস আছে, তা তার নজরে আসত কিনা সন্দেহ।

কিন্তু আমি তখন আশায় দুলে উঠেছি একটু একটু। বোধ হচ্ছে পাস-মার্ক পাচ্ছি পরীক্ষায়।

—সুযোগ দেবেন আমাকে ?

—হুঁ।—আবার সন্ধানীর চোখ পড়ল আমার ওপর—এবার বোধ হয় জামা-কাপড়টাও দেখে নিলেন। তারপর ডাকলেন, যদু! ওরে ও হতচ্ছাড়া যদু!

একটি রোগা লম্বা চেহারার চাকর দেখা দিল।

চা করতে বল্। আর ওপর থেকে 'জনা' নাটকটা নিয়ে আয়।

যদু চলে গেলে বললেন, আপনার চেহারা দেখে পছন্দ হচ্ছে আমার। গলার স্বরও বেশ ভরাট-গম্ভীর। একবার থামলেন: পুরানো নাটকটা তুলে দেব ভাবছি—এবার নতুন করে 'জনা' ধরব। —একটু থেমে বললেন, করেছেন ?

—না। একবার শুরু করা হয়েছিল, নামানো যায়নি শেষ পর্যন্ত।

—হুঁ খুব শক্ত নাটক। যেমন ড্রামা, তেমনি ইমোশন—তার সঙ্গে আবার ফিলজফি। বেশ হাইক্লাস জিনিস মশাই। আমরাই সব সময় বুঝতে হিমসিম খেয়ে যাই। আর পাড়াগাঁয়ের অডিয়েন্স তো নিতেই পারবে না!

যদু নাটক এনে রেখে গেল সামনে। বই খুলে একটা জায়গা বের করে বললেন, পড়ুন, তো। মানে—শুধু পড়া নয়—অ্যাক্‌টিং-এর মতো করে—বুঝেছেন ?

—বুঝেছি।—আমি পড়তে শুরু করলুম :

"রণ-মৃত্যু হ'তে কিবা আছে মা কল্যাণ ?

কে কোথাও ক্ষত্রিয়-রমণী

সন্তানে অঞ্চলে ঢাকি রাখে ?

কুলাঙ্গার পুত্র কার কামনা জননী ?

ক্ষত্রিয়-নন্দিনী কার ভীরু পুত্র সাধ ?

পিতার নিষেধ যদি,

না করিব রণ, ফিরে দিব হয়,

কিন্তু লোকময় কলঙ্ক-ভাজন—

রাখিব জীবন ছার,

মনে স্থান দিও না জননী।

রণে যদি যেতে মোরে মানা,

বন্দিয়া চরণ—

বিদায় হইয়া যাই জন্মের মতন !"

—ব্যাস—ব্যাস !—সুরপতি বাধা দিলেন : আর দরকার নেই। হবে—আপনার হবে। কলকাতাতেই থাকেন ?

—এসেছি আপাতত। একটা হোটেলে উঠেছি।

চা এল। আমার দিকে যেন ক্রমশঃ আকৃষ্ট হচ্ছেন সুরপতি। বললেন, শুধু চা খাবেন ? একটু খাবার-টাবার—

—ধন্যবাদ। খেয়েই বেরিয়েছি আমি।

চা খেতে খেতে সুরপতি নানা রকম গল্প করতে লাগলেন।

—গিরিশ চোখের সামনে ভাসছেন মশাই—মুস্তফির অ্যাক্টিং কি ভুলতে পারি—না ভোলা যায় তিনকড়িকেই ! সেদিন এখন গেছে। লোকের সে মেজাজই আর নেই এখন। আর এই যে বায়োস্কোপ দেখছেন—এই থিয়েটারকে খাবে !

—কিন্তু থিয়েটারের কাছে কি আর বায়োস্কোপ লাগে?—বললুম, ওতো শুধুই ছায়া। ওতে তো কোনো প্রাণই নেই।

—প্রাণের কথা বলছেন!—সুরপতি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন: প্রাণ এখন কোথায় আছে বলুন? ছেলেবেলা থেকে এই আমিই তো থিয়েটার অন্তপ্রাণ—কত টাকা ঢেলেছি, নিজের দু'খানা বাড়িই বেচে ফেললুম। কিন্তু কে তাকায় আমার দিকে? সবাই স্বার্থ বোঝে—সবাই পেতে চায়। বললে বিশ্বাস করবেন? ওই যে আপনাদের উনি—একজন বিখ্যাত অভিনেতার নাম করে বললেন: ওঁকে প্রত্যেক দিনের টাকা আগাম হাতে তুলে না দিলে বোর্ডেই নামবেন না। একদিন একটু টানাটানি ছিল, অর্ধেক দিয়ে বললুম—এখন তরিয়ে দিন বাকিটা পরে দিচ্ছি। করলে কি জানেন? বেল পড়ছে, তখনো এক দিকে আধখানা দাড়ি, আর এক পায়ে পা-জামা পরে বসে রয়েছে। বললেন, অর্ধেক টাকায় বেশি মেক-আপ হয় না। আর এই ড্রেসে আধখানা অভিনয় করেই বাড়ি চলে যাব!

আমি বললুম, টাকার জন্যে আমি আসিনি, অভিনয়ই আমার লক্ষ্য।

—ইয়া!—সুরপাতি খুশি হয়ে উঠলেন: এই তো চাই। আপনার চেহারা দেখেই তা বুঝতে পেরেছিলুম। বড়ো আনন্দ পেলুম মশাই কথাটা শুনে। কাল বিকেলে একবার আসুন বোর্ডে। রিহার্সেল হচ্ছে। আপনাকে দিয়েই প্রবীরটা ট্রাই করাবো।

নমস্কার করে বেরিয়ে এলুম। আমার চোখের সামনে রৌদ্রজ্জ্বলা কলকাতার রূপ তখন অপরূপ হয়ে গেছে। চলন্ত ট্রামে যেতে যেতে মনে হল—আমার দুধারে কোনো পৃথিবীর অস্তিত্ব নেই—একটা বিরাট স্টেজের ওপর দিয়ে যেন সরে সরে যাচ্ছে একটির পর একটি দৃশ্যপট।

তারপর—

তারপর নতুন পালা শুরু হল আবার।

মোমবাতিটার দিকে চেয়ে দেখছি। তার একটা তরল শুভ্র ধারা টেবিল বেয়ে নেমে আসছে। একটা ফোঁটা নীচে পড়ল। আর একটা। টপ—টপ—টপ—

বাইরে জ্যোৎস্নায় কার ছায়া দুলে যাচ্ছে? কে গেল? শেয়াল? কার পায়ের শব্দ উঠেছে? দেওয়ানজী?

দেওয়াজীই বটে। তাঁরই তো আসবার সময় হয়েছে এখন।

প্রবীর দিয়েই শুরু। রোহিতাশ্বের চাইতেও অনেক বেশি বুক কেঁপেছিল, অনেক বেশি ভয়ে হাত পা যেন হিম হয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু তারও চেয়ে ঢের বেশি মাদকতা ছিল রক্তে। আর সেই মাদকতাকে আরো উন্মাদ করে তুলেছিল সেই রাত্রেই আর এক নতুন সাকী।

তার নাম উষারাণী।

আমার বেশ মনে আছে, একজন পুরানো বুড়ো শিফটার একবার একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল আমায়।

একটা কথা বলব নির্মলবাবু?

—বলুন।

—আমার ঢের বয়েস হয়েছে মশাই, তিনটে থিয়েটার চরিয়ে এসেছি এর আগে। অনেক দেখেছি। একটু সাবধানে থাকবেন।

আমি হাসলুম।

—হাসির কথা নয়। এ বড় পাজী জায়গা মশাই। নরকের দরজা। পেছনে থেকে একটি ধাক্কা মেরে কখন সুট্ করে ঢুকিয়ে দেবে টেরও পাবেন না।

আমি আবার হাসলুম।

—আপনি তো উপদেশ দিচ্ছেন, অথচ মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে আপন্যার।

—দুত্তোর মদ!—ভদ্রলোক ভ্রূকুটি করলেন: দু-এক গ্লাস কারুর পেটে পড়লেই তার ইহকাল-পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল, এ সব ছেঁদো কথা আমি বিশ্বাস করিনে। মাত্রা রেখে খেলে কিছু হয় না। আমার বয়স কত জানেন? পঁয়ষট্টি। কিন্তু এখনো একটা আস্তো পাঁঠা আর তিন সের রসগোল্লা পার করে দিতে পারি। আমি সে কথা বলিনি।

—মেয়েদের ব্যাপার?

—ঠিক তাই। একে জমিদারের ছেলে, তায় অমন চেহারা। সবার ওপর এত কচি বয়েস। শুধু ব্যালে গার্লরা নয় মশাই—বড়ো বড়ো অ্যাকট্রেসরা পর্যন্ত ছিঁড়ে খেতে চাইবে আপনাকে। হুঁশিয়ার—খুব হুঁশিয়ার। মদে মানুষ মরে বটে কিন্তু ওটি একেবারে মাথায় পা দিয়ে ডুবিয়ে দেয়। ভাগাড়ের শকুন সব—খেয়াল রাখবেন ভালো করে।

মদ আমি খাই না—খাওয়ার প্রবৃত্তিও নেই। আর কাশীর সে রাতটাকেও তো আমি ভুলিনি। আজ সরসতী আমার কাছে কেবল খানিকটা গ্লানি নয়—খানিক লজ্জার ইতিহাসও নয়। সেই রাত্রির ছোট পটভূমিতে ধীরে ধীরে একটি অপরূপ ছবির মতো ফুটে আছে সে। আমার কড়ে-আঙুলের হীরের আংটিটার দিকে তাকালেই তা দেখতে পাই।

আমি হেসে চলে এসেছিলুম। কিন্তু এ কথাও সম্পূর্ণ ভুলতে পারিনি যে উষারাণীর সঙ্গে স্টেজে নামলেই হৃৎপিণ্ডে আমার সাড়া জাগত। তবু অনেক দিন পর্যন্ত খাঁটি ভালো ছেলেই ছিলুম আমি। সুরপতি আমাকে দেখিয়ে অন্যদের বলতেন—ছাখ্—শিখে নে। বড়ো আর্টিস্ট হতে হলে এমনি হওয়াই চাই—বুঝেছিস্?

যখন বলতেন, তখন হয়তো নিজেই টলছেন।

দেশের বাড়িতে আর ফিরলুম না—চিরদিনের মতোই তার

দরজা বন্ধ করে এসেছি। মা'কে কোন চিঠি আমি দিলুম না। সোজা দেওয়ানজীতে লিখলুম, আমি থিয়েটারে যোগ দিয়েছি—স্থায়ীভাবে কলকাতায় থাকব। জমিদারীতে আমার যে অংশ আছে তা থেকে আমায় মাসে মাসে তিনশো টাকা পাঠাবেন।

দেওয়ানজীর চিঠি এলো অনেক অনুনয়-বিনয় করে।

—ছিঃ বাবা, এসব পাগলামো করতে আছে? আর মা-র ওপরেই বা কি কেউ এমন ভাবে রাগ করে? তুমি বংশের বড়ো ছেলে—এতবড়ো পরিবারের মান-ইজ্জত সব তোমারই ওপর। ফিরে এসো, ভালো হও। কলকাতার পাবলিক থিয়েটার মানুষের সর্বনাশের রাস্তা, ওখানে যে যায় তারই ভরাডুবি হয়, অতএব—

উত্তরে লিখলুম, আপনার কাছে আমি উপদেশ চাইনি, পাওনা টাকা চেয়েছি। অতএব আপনিও টাকাই পাঠাবেন, উপদেশ নয়।

টাকাই আসতে লাগল তার পর থেকে।

বেশ নাম করে ফেললাম ছ'সাত মাস পরেই। শেয়ালদার হোটেল ছেড়ে দিয়ে বাসা নিলুম শ্যামবাজারে। চল্লিশ টাকায় ছোট একটা দোতলা বাড়ি। সুরপতিবাবু থেকে আরম্ভ করে থিয়েটারের অভিনেতা, কর্মচারী—এদের সকলের আড্ডাখানা হয়ে উঠল বাড়ীটা। দিনগুলো যেন ঘোরের মধ্যে কেটে যেতে লাগলো।

থিয়েটার থেকে ফিরে সেদিন বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছি, চাকর এসে জাগলো।

—বাবু আপনার ভাই দেখা করতে এসেছেন।

বিনু! বুকের ভেতরে একটা ধাক্কা লাগল আমার। শেয়ালদার হোটেলে থাকবার সময় দিন দুয়েক এসেছিল, তারপর চার মাসের মধ্যে তার আর দেখা নেই। হঠাৎ কেন এল—ঠিকানা বা পেলো কোথায়? বাড়ির হিসাব থেকে আমি তো খারিজ হয়ে গেছি! অনেক আগেই।

বিমু এল। প্রথমটা কেমন কুণ্ঠাবোধ হল, ভালো করে চাইতে পারলুম না ওর দিকে। কিন্তু বিমু এমন ভাবে কথা বললে যে নিজের অস্বস্তির জন্যে আমিই লজ্জা পেলুম।

—খবর নিতে এলুম নিমুদা।—ভালো আছো ?

—ভালোই আছি। তোর পড়াশুনা ?

—চলছে একরকম।—বিমু হাসল : তোমার নাম তো চারিদিকে—ফেটে পড়েছে নিমুদা। যখন পোস্টারে তোমার নাম দেখি—পথে-ঘাটে তোমার থিয়েটার নিয়ে আলোচনা করে লোকে, তখন ভারী আনন্দ হয় আমার। ভাবি আমারই তো দাদা, যে-সে লোক পেয়েছিস নাকি ?

আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে তাকালুম। ঠিক একথা তো আমি আশা করিনি।

—কিন্তু বাড়িসুদ্ধ, সবাই তো আমায় কুলাঙ্গার বলছে।

—কি আসে যায় ?—বিমু উত্তেজিত হয়ে উঠল : ছেড়ে দাও ওদের কথা—ওরা গেঁয়ো কন্‌জারভেটিভ্‌। তুমি যে কত বড়ো কীর্তি গড়তে যাচ্ছ—সে ওরা কেমন করে বুঝবে ?

মা-র ওপরে রাগ করে এসে যেদিন থিয়েটারে ভিড়েছিলুম, সেদিন মনে যত জেদই থাক, একটা অস্বস্তির কাঁটাকে কোন মতে ভুলতে পারিনি। চিন্তার ভেতরে কোথায় লুকিয়ে থাকত কেমন একটা অপরাধের চেতনা, থেকে থেকে আমায় চাবুক মারতে চাইত। কিন্তু আজ বিমু এসে সেই অপরাধটাকে অনেকখানি নামিয়ে দিলে।

—তা হলে তুই বলছিস ভালোই করেছি।

—অন্যায় কিছু করোনি। তুমি শিল্পী—নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছো। পাড়াগাঁয়ের বাঁশবনে শিয়াল রাজা হয়ে তুমি জমিদারি করতে যাবে কোন দুঃখে ?—বিমুর চোখে উত্তেজনায় জ্বলে উঠল : আমি পুরো সাপোর্ট করছি তোমাকে।

আমি খুশি হয়ে বিনুর জন্যে চা আর খাবার আনালুম। জিজ্ঞেস করলুম, আমার প্লে তুই দেখেছিস?

বিনু অভিমান করে বললে বা-রে, পয়সা খরচ করে দেখব নাকি? তুমি তো আমায় পাশও দিলে না। বাড়ি বদলেছ অথচ খবরটা পর্যন্ত দাওনি—পাছে গিয়ে পাশ-টাশ চাই। শেষে থিয়েটারে গিয়ে খবর নিই। তাও কি ঠিকানা সহজে দিতে চায়? অনেক করে বোঝালুম আমি তোমার ভাই, তারপরে—

লজ্জিত হয়ে বললুম, অপরাধ হয়ে গেছে, তোকে আমি বুঝতে পারিনি। আচ্ছা—শনিবারে আসিস থিয়েটারে, পাশ লাগবে না।

তারপর থেকে নিয়মিত যাওয়া-আসা করতে লাগল বিনু। আমি সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলুম। কিছুদিনের ভেতরে সুরপতির সঙ্গেও দারুণ খাতির জমে উঠল তার।

সুরপতি বলতেন, চমৎকার ছেলে আপনার ভাই এই বিনয়। ওকেও নামিয়ে দিই।

আমি হেসে বলতুম, এ রাস্তা ওর জন্যে নয়। ও অ্যাডভোকেট হবে।

এখন ভাবি, বিনু অ্যাডভোকেট হয়েছে বটে, কিন্তু অভিনেতা হিসেবে ও আমার চাইতে ঢের বড়ো। ছেলেবেলার সেই জ্বালাটা একদিনের জন্যেও ভুলতে পারেনি। কী নিপুণ অভিনয়ের ভেতর দিয়েই না সব চাইতে ভালো ক্ল্যাপটা নেবার জন্যে ও তৈরী হচ্ছিল।

মোমবাতিটা দপ্ করে উঠল। চোখের সামনে আর একটা ছবি দেখা দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। এমনি করেই সেদিন ঘরের তিনটে আলো কিছু দপ্ দপ্ করে হঠাৎ একরাশ অন্ধকারের ভেতর তলিয়ে গিয়েছিল। সেদিন আমি প্রথম মদ খেয়েছিলুম।

তার আগে চন্দনার কথা।

আশ্চর্য ফর্সা রং ছিল মেয়েটার—কালো চুল বাদ দিলে ঠিক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের চেহারা। নিঃসন্দেহে ইউরোপীয়ানের রক্ত ছিল গায়ে। থিয়েটারে নাচের দলে থাকত—কথাবার্তা বেশি বলতে না হলে পৌরাণিক নাটকে কৈলাসে মহাদেবের পাশে পার্বতী সাজিয়ে বসিয়ে দেওয়া হত তাকে। দীর্ঘ সবল শরীর—নাচের গুণে নিখুঁত সুঠাম হয়ে উঠেছিল।

চন্দনার ওপর একটা স্থূল লোলুপ দৃষ্টি অনেকেরই ছিল, তাকে বাঘের মতো পাহারা দিত জগৎ পাল। কুমারটুলির অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে সে। ডনবৈঠক-করা লোহার মতো শরীর—মদের পিপে শেষ করে দিয়েও তার পা এতটুকুও টলত না। থিয়েটারে সেনাপতি ভীম কিংবা গুণ্ডার পার্ট ছিল তার বাঁধা। আরো একটা গুণ ছিল জগৎ পালের—চমৎকার বাঁশি বাজাতে পারত সে। তার রুক্ষ কর্কশ চেহারার আড়ালে ওইটুকুই যেন কোমলতায় ফল্গুর মতো বয়ে যেত।

সেই রেখেছিল চন্দনাকে। আর মেয়েটি যে তার সম্পূর্ণ একারই সম্পত্তি—ওর ওপর কারো নজর পড়লে যে তার অদৃষ্টে দুঃখ আছে—এই সত্যি কথাটা জগৎ পাল কখনো গোপন করত না।

কিন্তু দৈত্যের মুঠোটাও কোন অসতর্ক মুহূর্তে যে আলগা হয়ে যায়—এ-কথা জগৎ পালের জানা ছিল না।

সেই বুড়ো শিফ্‌টারের উপদেশ আমি ভুলে গিয়েছিলুম। আশপাশের দুটো চারটে চকচকে চোখের আহ্বান, টুকরো টুকরো অর্থভরা কথা—সময় সুযোগ পেলে কারো কারো একটু বেশি মাত্রায় কাছে ঘেঁসে বসা, কখনো কখনো পেছন কাঁধের ওপর দুটো একটা তপ্ত শ্বাস আমার কাছে যে কোন অর্থই বয়ে আনেনি তা নয়; কিন্তু নিজের চারদিকে তখনো আমি শক্ত একটা বর্ম তৈরি করে রেখেছিলুম। আমি শিল্পী হতে এসেছি—থিয়েটারে এলেই যে

বখাময়ের দলে ভিড়ে যেতে হবে, আত্মহত্যা করতে হবে তিলে তিলে, এই চল্‌তি ধারণাটাকে মিথ্যে প্রমাণ করব এই আমার প্রতিজ্ঞা। ওরাও হয়তো সে কথা জানত।

সেদিন দ্বিতীয় অঙ্কের পর পর তিনটে দৃশ্যে আমার কোন পার্ট ছিল না। দিনটাও অসম্ভব গুমোট—মাথাটা ধরেই ছিল খানিকটা। আমি একটু বিশ্রামের জন্যে স্টেজের একেবারে পেছন দিকটায় চলে গেলুম। সেখানে কতকগুলো কাটা সীন, এলোমেলো স্টেজ প্রপার্টি আর দু-তিনটি কৌচ ছড়িয়ে ছিল ইতস্তত। তারই একটাতে চোখ বুজে আমি শুয়ে পড়লুম—অন্তত আধঘণ্টা বিশ্রাম করতে পারব।

হঠাৎ আমার মুখে কার নিশ্বাস পড়ল, খানিকটা ঝুরো চুল ছোঁয়া বুলিয়ে গেল গালে কপালে, কার দুটো পাতলা ঠোঁট চেপে বসল আমার ঠোঁটের ওপর।

সারা শরীর শিউরে উঠল, চমকে তাকিয়ে দেখলুম। চন্দনা।

বললুম, ছি-ছি—এ কী করছ ?

খিল খিল করে হেসে উঠল চন্দনা: ভারী রাগ হল—না ? উষা হলে বুঝি খুব খুশি হতে ?

আমি কি বলতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই চন্দনা ছুটে পালিয়ে গেল।

আমি পাথর হয়ে বসে রইলুম।—না জগৎ পাল নয়। তার জন্যে আমার ভয় নেই—সহানুভূতিও না। কিন্তু উষারাণীর কথাটাই আমার রক্তে দোলা জাগিয়ে দিয়ে গেল। তার সঙ্গে অভিনয় করতে নামলে আমার নেশা একটু লাগে, তা আমি জানি। কখনো কখনো আচমকা খেয়ালে মনে হয় তার মুখের ওপর সরস্বতীর একটা ছায়া ফুটে উঠেছে। কিন্তু আমার সেই মনের এতটুকু দুর্বলতার খবরও কি এদের অজানা নেই ? ওরা ঠিক টের পেয়েছে, আমি উষাকে—

ঠিক তখন শ্রীপদ এল। থিয়েটারের কমিক অ্যাক্‌টার।

—দেখে ফেলেছি দাদা। ডুবে ডুবে জল খাওয়া—অ্যাঁ!

আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলুম: শ্রীপদবাবু!

—কোনো ভয় নেই দাদা—কোনো ভয় নেই। ও রকম লুকিয়ে এক-আধটু না হলে কি রস জমে? হোঁতকা জগৎ পালটা কত বড়ো গাধা তাই ভাবছি কেবল। তা আমি কাউকে বলতে যাচ্ছি না—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। দয়া করে একটা সিগারেট যদি দাও—তা হলেই পাকাপাকি আমার মুখ বন্ধ।

শ্রীপদ কথার খেলাপ করেনি; মুখ সেই বন্ধই রেখেছিল। কিন্তু চন্দনা তার ওইটুকুও নষ্টামির মধ্য দিয়ে আমার ভেতরে ঊষারাণীকে জাগিয়ে দিয়ে গেল। যা আমার চেতন-অচেতনার সীমান্তে দুলছিল, তাকে নিয়ে এল একেবারে সামনে। আমি আবিষ্কার করলুম, ঊষাকে পাওয়ার জন্যে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমার ভেতর ধীরে ধীরে ফুঁসে উঠছে।

মাস ছয়েক বাদে একদিন সন্ধ্যেবেলা নিজের ঘরে চুপচাপ বসেছিলুম। কালও যখন স্টেজের একধারে এক ফাঁকে চুপি চুপি এসে চন্দনা ফিসফিসিয়ে আমায় বলেছে, আমি কি ঊষার চাইতে দেখতে খারাপ। তার পরেই আমার পিঠে একটা চিমটি কেটে ছুটে পালিয়েছে। আর সারাটা দিন কেমন একটা ভার আমার জমে রয়েছে মাথার ভেতরে। বুঝতে পারছি, ঊষার আকর্ষণ থেকে নিজেকে কোন মতেই যেন ফেরানো যাচ্ছে না—যে পিছল পথে কোনোদিন আমি যেতে চাই, তা-ই আমায় টানছে। এ উচিত নয়—কোনা মতেই উচিত নয়।

মা-র কথা মনে পড়ছিল। নিষ্ঠুর ভাবে দুঃখ দিয়ে এসেছি তাঁকে। ফিরে যাব। এবার গিয়ে বলব, মা তুমিই ঠিক বুঝেছিলে। আমি নরকের দিকেই পা বাড়িয়েছিলুম—কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে

পেয়েছি। তাই ফিরে এসেছি তোমার কাছে—ক্ষমা কর আমাকে।

বেদনায় অনুতাপে আমার চোখে জল এসেছিল। আর তখনি দরজায় ভারি পায়ের শব্দ।

—কি হে রাজপুত্র, চুপচাপ বসে যে?

সুরপতিবাবু। ওই নামেই তিনি আমায় ডাকেন।

—এমনিই বসে আছি। আসুন।

—একা একাই সন্ধ্যাবেলায় ভূতের মতো বসে থাকে নাকি? চলো আমার সঙ্গে।—তারপর হাসলেন: ভয় নেই হে ভয় নেই। তোমার চিরিত্তির খারাপ করে দেবো না। তুমি গুড্ বয়—সে আমি জানি। চলো।

বেরিয়ে পড়লুম। ভাবলুম, যেখানে হোক খানিকটা ঘুরে এলে মাথা কিছুটা ঠাণ্ডা হবে হয়তো। দেখলুম, সুরপতিবাবু গাড়িও নিয়ে এসেছেন।

—গাড়ি কেন আবার?

—একটু দূরে যাব। কালীঘাটে। ওঠো-ওঠো।

—কালী-দর্শন করতে?—উঠে বসে জিজ্ঞেস করলুম আমি।

গাড়োয়ানকে হাঁকাতে বলে সুরপতি মুখ বাঁকালেন; আরে—আমাদের মতো মহাপাপীর পক্ষে মায়ের মন্দিরে তো প্রবেশ নিষেধ। যাব উষারাণীর ওখানে।

—উষারাণী।

আমার রক্ত জমে গেল মুহূর্তে।

—সেখানে কেন?

সুরপতি মুচকে হাসলেন: তোমাকে চায়ের নেমতন্ন করেছে। বেচারীর ভারি সাধ—নিজের হাতে একদিন তোমাকে এক-আধটু খাবার-দাবার করে খাওয়ায়। নিজে থেকে তো বলতে পারে না—

তুমি যা পিউরিটান। তাই আমাকে পাঠিয়েছে দূত করে—তোমায় ধরে নিয়ে যেতে।

আমার বুকে হাতুড়ি পড়তে লাগল। মনে হতে লাগল, গাড়ির ছুটো ছুটন্ত ঘোড়ার নাল-বাঁধা পায়ের আওয়াজ ছাপিয়ে আমার হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ উঠে আসছে।

—আমি যাব না। কোচয়ানকে গাড়ি রুখতে বলুন।

—পাগল হলে? সুরপতি আমার হাত চেপে ধরলেন: মেয়েটা সাধ করে সারাদিন ধরে তোমার জন্যে খাবার করেছে। তুমি না খেলে কত কষ্ট পাবে বল দিকি? আর তার ওখানে একটু চা জলখাবার খেলেই কি তোমার চরিত্তির নষ্ট হয়ে যাবে?

আমি চিৎকার করে উঠতে চাইলুম—পারলুম না। গাড়ি চলতে লাগল—আমার নিশ্চিত পরিণামের দিকেই টেনে নিয়ে চলল আমাকে। আর আমার হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ ঘোড়ার পায়ের শব্দ ছাপিয়ে যেন সারা কলকাতাময় ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

তারপর—

তারপর প্রলোভনের দিনগুলোকে আর এক একটা করে মনে রাখতে পারছি না। উষারাণীর নিজের হাতে তুলে দেওয়া প্রথম মদের গ্লাস। একের পর আর এক। ঘরের আলোগুলো জ্বলতে জ্বলতে দপ্ দপ্ করে নিভে গেল। তার মধ্যে সুরপতির একটা হাসির আওয়াজ কি শুনতে পেয়েছিলুম? জানি না।

কেবল চন্দনা দাঁতে দাঁত ঘষে বলেছিল, ডাইনি। ও-ই তোমায় কেড়ে নিলে।

আমি তখন নির্লজ্জ হয়ে গেছি। আবরণ ভেঙে যাওয়ার পরে সংকোচের কোনো বালাই-ই মনের কোণে কোথাও নেই।

হেসে বলেছিলুম, তোমার এত হিংসে কেন? জগৎ পাল তো তোমার রয়েইছে।

—একটা গুণ্ডা—একটা গোঁয়ার!—চন্দনার চোখে আগুন ঠিকরে বেরিয়েছিল : ও যেন যমদূতের মতো আগলে আছে আমায়। ভারী একমুঠো টাকা দিয়ে আমার মাথা কিনে রেখেছে। ওকে একদিন আমি বিষ খাইয়ে মেরে ফেলব—এই তোমায় বলে দিচ্ছি। আর—আর পারি তো তোমার ওই সাধের উষারাণীকেও।

কিন্তু চন্দনা তখন জানত না, সে বিষ তার নিজের জন্যেই তৈরী হচ্ছে!

আর—আর সব চেয়ে ভালো অভিনয় করে গেল বিন্নু। ঠিক চলে এল কালীঘাটে উষার বাড়িতে। সেখানেই তখন ডেরা বেঁধেছি আমি। ঘৃণা লজ্জা ভয়ের সমস্ত স্তরগুলো পার হয়ে গেছি।

বিন্নুকে দেখে আমি আঁতকে উঠেছিলুম, একবারের জন্যে শুকিয়ে গিয়েছিল উষারাণী মুখ।

বিন্নু হেসেছিল। সহজভাবে—নিঃসংকোচে।

—লজ্জা কী নিমুদা? তুমি আর্টিস্ট—তোমার যোগ্য সঙ্গিনীই তো তুমি বেছে নেবে। এই যে বৌদি—পালাচ্ছেন কেন আমাকে দেখে? আরে—আরে আপনি তো আমার গুরুজন। দাঁড়ান—প্রণাম করি একটা।

সাষ্টাঙ্গেই প্রণামটা করেছিল।

॥ ৪ ॥

রাত একটা।

এই সাতমহলা শূন্য বাড়িটায় এখন অদ্ভুত স্তব্ধতা।

তক্ষক ডাকছে না—প্যাঁচা ডাকছে না—আমাদের সাতপুরুষের নিশ্বাস নিয়ে বাতাস আসছে না। হঠাৎ যেন জীবিত-মৃত দুই দলের পৃথিবীতে আমি নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। যারা বেঁচে আছে, তারা এ বাড়িতে কেউ নেই, যারা মরে গেছে, তারাও কিছুক্ষণের জন্য ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি জীবিত নই, মৃতও নই—তাই একা এখানে প্রহর জাগছি।

মনে পড়ছে, উষারাণীকে নিয়ে বারোটা বছর কি ভাবে আমার কেটে গিয়েছিল।

দেশে এসেছিলুম দু'বার।

একবার মার মৃত্যুর পরে। মুখাগ্নির সুযোগ মেলেনি—কিন্তু শ্রাদ্ধে আমাকেই বসতে হয়েছিল। শেষবারের জন্যে অন্নপিণ্ড তুলে দিতে ভেবেছিলুম—এই প্রহসনের কোনো দরকার ছিল না।—আমার হাতের দেওয়া অশুচি অন্ন মা কখনোই গ্রহণ করবেন না। দ্বিতীয়বার এসেছিলুম আমার সম্পত্তির একটা অংশ বিনুকে বিক্রি করে দশ হাজার টাকা নিয়ে যেতে। তারপর আবার বিশ হাজার টাকার দরকার হল। এবার আর আমার কষ্ট করে আসতে হয়নি। বিনু তখন ওকালতী শুরু করেছে, তার ছোট ভাই চিনু—যার ভালো নাম চিন্ময়—সে কলকাতায় চায়ের ব্যবসায় মন দিয়েছে। বিনুই

চিন্নুর হাত দিয়ে আমায় টাকা আর কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিল; আমি সই করেই নিশ্চিন্ত হয়েছি।

সত্যিটা আবিষ্কার করেছিলুম আরো কিছুদিন পরে। ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে আমার প্রায় সত্তর হাজার টাকার সম্পত্তি তখন বিন্নু গ্রাস করে নিয়েছে। পৈতৃক বাড়িতে একটুখানি মাথা গোঁজবার জায়গা ছাড়া আমার এতটুকু দাবি-দাওয়া কোথাও নেই।

আর—আর ত্রিশ হাজার টাকাই আমি তুলে দিয়ে ছিসুরপতি-বাবুকে।

এখন জানি, আমাকে এত আদর করে থিয়েটারে ডেকে নেবার পিছনে কী স্বার্থ ছিল সুরপতিবাবুর। কেন এইভাবে তিনি উষার হাত দিয়ে আমার মুখে মদের পাত্র তুলে দিয়েছিলেন, তার আসল রহস্যও আমার কাছে গোপন নেই আর। সুরপতি যখন মারা গেলেন, তখন আইনতঃ আমিই থিয়েটারের মালিক হয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু দেনায় তখন চারদিক ডুবু-ডুবু। সেই অন্তঃসারশূন্য মালিকানার রসিকতাটা যে কী ভয়ঙ্কর, সেটা বুঝতে বেশিদিন আমার সময় লাগেনি।

আর বিন্নু?

সুরপতির কথা আমি বুঝতে পারি। আমাকে দোহন করেন টাকা আদায় করা তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল বটে, কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্য নয়। থিয়েটারকে সত্যিই ভালোবাসতেন ভদ্রলোক—নিজে ডুবেছেন তার পেছনে, আমাকেও ডোবাতে চেয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে। কিংবা হয়তো অবিচার করছি—আমার সাহায্যে সবটা আবার গড়ে তুলতেই চেয়েছিলেন। তাই উষারানীকে সেদিন লোভানী হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বিন্নু ইচ্ছে করেই আমায় রসাতলের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল। চিরদিন সে আমায় উৎসাহ দিয়েছে আর বলেছে, ঠিক আছে নিমুদা। আর্টের সাধনা করছ তুমি, কত

ব্যাপারটা ঠিক যে কী হয়েছিল কেউ জানে না। প্রচণ্ড শক্তিমান জগৎ পাল—গুণ্ডা আর ভীমের ভূমিকা ছিল যার একচেটে আর অর্কেস্ট্রার মধ্যে মধ্যে যে আশ্চর্য সুন্দর বাঁশি বাজাত—তার মনের ভেতরে কখন যে তুফান উঠেছিল কেউ তা টেরও পায়নি। সে ঠিক বুঝেছিল, চন্দনা আর তার নয়—চন্দনা তাকে আর সইতে পারে না। কিন্তু অমন জোয়ান মানুষটা অত সহজেই নিজের দাবি ছেড়ে দিতে চায়নি।

শেষ পর্যন্ত মদের গ্লাসে বিষ মিশিয়ে খাওয়ালো চন্দনাকে। তারপর কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি বেঁধে অত বড়ো শরীরটাকে অবলীলাক্রমে ঝুলিয়ে দিলে। অমন পলকা দড়িটা ওই বিপুল দেহের ভার কী করে সইল—তা ভাবতে আজও আশ্চর্য লাগে আমার।

খবর পেয়ে দেখতে গিয়েছিলুম।

মেজের ওপর বিষে নীল হয়ে এলিয়ে আছে চন্দনার শরীর—অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মতো তার তুষারশুভ্র গায়ের রঙ কী অদ্ভুত বিবর্ণ হয়ে গেছে। যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ শরীরটার ওপর ছায়া ফেলে ফেলে কদাকার দেহটা দুলছে জগৎ পালের—যেন মৃত্যুর পরেও ওকে পাহারা দিচ্ছে। তার দাবি সে কিছুতেই ছাড়বে না।

আর একখানা চিঠি রেখে গেছে জগৎ পাল।

"আমি মদের সঙ্গে বিষ খাওয়াইয়া চন্দনাকে খুন করিয়াছি। আমার ফাঁসি হইত। কিন্তু পুলিশকে আর সে কষ্ট আমি দিতে চাহি না। তাই নিজেকে ফাঁসি দিলাম। চন্দনা এবং আমার মৃত্যুর জন্য একমাত্র আমিই দায়ী।"

না, চন্দনার জন্যে আমার কোন অনুভূতি নেই। ওর সম্পর্কে আমার মনে কখনো এতটুকুও দুর্বলতা জাগেনি। আর চন্দনাও কি আমাকে ভালোবেসেছিল? তাতে আমার সন্দেহ আছে। আসলে

জগৎ পালের যে নিষ্ঠুর রাহুর প্রেম ওকে ঘিরে রেখেছিল—তাই ওর নিঃশ্বাস বন্ধ করে এনেছিল, যে কোনো একটা উপায়কে আশ্রয় করে তার বাইরে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল চন্দনা। আমি না হয়ে সে যে কেউ হতে পারত—আমি একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

অভিনয়-জীবনে মৃত্যু আমি অনেক দেখেছি, সিরোসিস্ অফ লিভারে জর্জরিত হয়ে মরতে দেখেছি একদা স্বনামধন্য অভিনেতাকে, অনাহারে তিলে তিলে হারিয়ে যেতে, যে অভিনেত্রীর পায়ের তলায় কলকাতার অনেক বড়ো বড়োধনীর মাথা একদিন লুটিয়ে পড়ত—বস্তির ঘরে কি ভাবে এক মুখ রক্ত তুলে সে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল, সে দৃশ্যও আমার অদেখা নয়। আসলে অভিনয় করতে করতে জীবন-মৃত্যু দুঃখ-সুখ সব এক হয়ে যায় —তখন সব-কিছু সেই পাউডারের কণা-ছড়ানো পেইন্টের দাগ-ধরা আয়নার মতো বিচিত্র হয়ে ওঠে—যা সত্য অথচ সত্য নয়। আজকের অভিনয়ের রাজা কালকে যেমন অবলীলাক্রমে ফকিরের পার্টে নামে, ঠিক তেমনি করেই একদিনের সৌভাগ্য যখন দুর্ভাগ্যের রূপ ধরে, তখনো তার মধ্যে কোনো ক্ষোভ থাকে না। সেও তো পার্ট বদলানো মাত্র। আর মৃত্যু? দিনের পর দিন থিয়েটারের স্টেজে মৃত্যুর মহলা দিতে দিতে শেষকালে সত্যিকারের মৃত্যু যখন আসে, তখনো জীবনের সব চাইতে বড়ো ক্ল্যাপটা ছাড়া আর কিছুই চাইবার থাকে না।

জগৎ পাল আর চন্দনা মরেছিল কোনো ভালো প্লে-র শেষ দৃশ্যের মতো, খুব ভালো অভিনয় করেছিল। আর মনে মনে ক্ল্যাপ দিয়ে আমি বলেছিলুম, বাঃ—এই তো খাসা। এর বেশি আর কী চাই? 'বলিদানের' করুণাময় আর 'প্রফুল্লর' প্রফুল্ল—একসঙ্গে একজোড়া নাটকের চমৎকার বিয়োগান্ত পরিণাম!

সিনিকের মতো শোনাচ্ছে? না—না। এই হয়—এমনিই

হওয়া উচিত। শোক-দুঃখ-সুখ-আনন্দ—এদের প্রত্যেকটি আবেগকে যখন দিনের পর দিন অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলি, তখন তারা পুরো সত্যও থাকে না—পুরো মিথ্যেও নয়। সেই সত্য-মিথ্যার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে—শেষ পর্যন্ত দুটোরই সীমারেখা হারিয়ে যায়। তখন আমরাই সত্যিকারের দার্শনিক হয়ে উঠি। এত বেশি কেঁদেছি যে আর কান্না আসে না ; এত বেশি আবেগ জাগিয়েছি বার বার যে আবেগের সমস্ত উৎসই শুকিয়ে যায়।

আজ সেই দৃষ্টি নিয়েই দেখছি জীবনকে। দুঃখ নেই, সুখ নেই, প্রতিবাদ নেই, প্রত্যাশাও নেই। এই পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে যেতে তাই আমার এতটুকুও দুঃখ হয় না, যা কিছু করেছি তার জন্যে কোনো প্রতিক্রিয়া মনের ভেতরে কোথাও জাগে না।

মনে আছে, তখন থিয়েটার আমিই চালাচ্ছি। চারদিকের দেনা আর ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি পথ কেটে। সেই সময় একটা জলসার নেমন্তন্ন এল। গড়িয়ার দিকে এক বাগানবাড়িতে।

উষাকে নিয়ে আমি গেলুম। চেনা-অচেনার ভিড়ের মধ্যে দেখি বিনুকে।

—হাঁ রে, তুই এখানে ?

অ্যাড্‌ভোকেট বিনু এসে পরম ভক্তিভরে আমাকে আর তার 'বৌদি'কে প্রণাম করলে। হেসে বললে, মুকুন্দবাবু আমারই ক্লায়েন্ট কিনা। তাই ছাড়লেন না—আসতেই হল।

কিন্তু বিস্ময় সেখানে নয়। যে বাঈজীটি আজকের গানের আকর্ষণ, সে হঠাৎ সকলের মাঝখান থেকে এগিয়ে এল। তারপর ভাঙা বাংলায় বললে, নমস্কার, চিনতে পারেন ?

মুহূর্তের জন্যে চোখের সামনে কতগুলো এলোমেলো রেখার ভাঙচুর চলল। তারপর আমি বললুম, সরস্বতী ?

—জী হাঁ। ঠিক চিনেছেন।—পানে রাঙানো ঠোঁটে হাসির

বিদ্যুৎ দেখা দিল, কালো সুর্মাটানা চোখ চকচক করে উঠল : তবে এখন নাম বদলেছি। মোতি।

—মোতি!

—জী। ওই নামেই সবাই এখন আমায় চেনে।

আমার রক্তের মধ্যে সেই ঝড়ের রাতটা জেগে উঠতে চাইছিল, কিন্তু অনেক অভিনয়ের পর, অনেক আবেগ নিয়ে ছিনিমিনি করবার পরে আঠারো বছরের সেই দিনগুলোকে আমি হারিয়ে এসেছি। সহজ হবার চেষ্টা করে বললুম, তুমি কলকাতায় এলে কী করে?

আমাদের আর ঠিক-ঠিকানা কী, সারা হিন্দুস্থানই তো আমাদের ঘর। এক বছর আছি এখানে। আপনার থিয়েটারও আমি দেখেছি। তখনই জানতুম—বাবু গুণী লোক।

মুকুন্দবাবু—আজকের গৃহস্বামী এগিয়ে এলেন।

—আলাপ আছে নাকি?

—থোড়া জান্-পহ্চান ছিল বহুৎ রোজ আগে—সর্সতী হাসল। তারপর বললে, আচ্ছা—নমস্তে। পরে দেখা হবে হয়তো।

বিনু হাসল, আর্টের লাইনে যারা থাকে, তারা নিমুদাকে সবাই জানে।

অ্যাড্ভোকেট বিনুর সে হাসির একটা অন্য অর্থ ছিল। আজ সে অর্থ বুঝতে আমার বাকী নেই।

আমার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল উষারাণী। তার দিকে একটা বাঁকা দৃষ্টি ফেলে মৃদু হেসে চলে গেল সর্সতী। কিন্তু এতটুকু ছায়া পড়ল না উষার মুখে—এক বিন্দু কৌতূহল নয়। এই গুণটা ওর বরাবর দেখছি। অনেক দিন ওর সঙ্গে কাটিয়েছি, মনে হয় ভালোও বেসেছিলুম। ওর সম্পর্কে কোনো একনিষ্ঠতার প্রতিশ্রুতি আমি কোনোদিন দিইনি—ও-ও কখনো দাবি করেনি। চন্দনাকে আমি পছন্দ করিনি, গুণ্ডা জগৎ পালের পাগলামির খবরও জানতুম

—তাই চন্দনাকে কোনো রকম প্রশ্রয় দিতেই আমার বাধত—মনে হত, জগতের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করছি। তাই বলে, উষাই যে আমার একতমা ছিল, এত বড়ো মিথ্যে বলতে পারব না। মদের মাথায় কত জায়গায় উদ্দাম রাত কাটিয়েছি—এক রাত দু-রাতের কত সঙ্গিনী এসেছে গেছে—তাদের সকলের কথাও আমার মনে নেই। উষা কোনদিন তার জন্যে এতটুকু আপত্তি তোলেনি, কখনো বলেনি, এ তোমার অন্যায় হচ্ছে। আসলে থিয়েটারের সেই নির্বেদ তাকেও স্পর্শ করেছিল।

যখন নেশার ঘোর কেটেছে, সাদা চোখে ভেবেছি নিজের কথা, তখন মনের ভেতর দুটি মেয়েকেই আমি দেখেছি—বহুবল্লভের সেই অসংখ্য নৈশ-নায়িকাদের এতটুকু ছায়াও আর চোখে পড়েনি। একজন আমার প্রথম যৌবনের প্রথম সাকী, আর একজন অনেক দুঃখ-সুখের প্রায় নীরব সহচারিণী—সেই সরস্বতী আর উষা ছাড়া কাউকেই কোথাও আমি দেখতে পাচ্ছি না।

কিন্তু তত্ত্বকথা থাক। সেই রাত্রির জলসার আর একটা জিনিস ভুলতে পারিনি আমি।

তানপুরা নিয়ে প্রথম যে গানটা ধরেছিল মোতি—তাতে আমি চমকে উঠেছিলুম। এ সেই গান—যা ডাল্-কি-মণ্ডির সেই নেশা-ধরানো প্রথম সন্ধ্যাটিতে প্রথমে শুনিয়েছিল সরস্বতী। যা আমি শুনেও শুনিনি—যা আমার চেতনার মধ্যে ছেঁড়া স্বপ্নের মতো ঘুরে বেড়িয়েছিল।

ইচ্ছে করে আমাকে শোনাবার জন্যেই গানটা আরম্ভ করেছিল মোতি? কিংবা নিতান্তই যোগাযোগ?

আর সেই সঙ্গে দেখছিলুম, ঘরের জোরালো আলোয় তানপুরার যেখানে ওর আঙুলগুলো নানা ছন্দে খেলা করছে, সেখান থেকে ঠিকরে ঠিকরে উঠছে একটা উজ্জ্বল ধারালো দ্যুতি। একটা হীরের

আংটি। কিন্তু ওই আংটিটাকে কি আমি চিনি? ওইটেই কি মা আমায় দিয়েছিলেন? আমার কড়ে আঙুলে যে আংটিটা এখনো রয়েছে, সেই ঝড়ের রাত্রিতে ওই আংটিটার সঙ্গেই কি সেটা বদল হয়ে যায়নি?

কিছুক্ষণ আমার চোখের পলক পড়ল না।

কিন্তু যে জগৎ সত্য নয়—অথচ মিথ্যাও নয়, আমি সেই জগতের মানুষ। আমার কাছে সব সমান।

এতদিন—এত ঘটনা—এত অভিনয়, স্মৃতির ভেতর সেগুলোকে এখন আর গুছিয়ে তুলতে পারছি না। কতগুলো ছাড়া-ছাড়া ছবি আসছে এখন। আমি তাদের বাছিনি, সাজাইনি—আমার চিন্তার ভেতর থেকে আপনিই যেন সেগুলো নির্বাচিত হয়ে আসছে। আমার মনের আড়ালে কোথাও একটা মন রয়েছে—সে-ই তাদের সামনে আমায় এগিয়ে দিচ্ছে। আমার কিছু করবার নেই।

ঠক্—কঁ—কঁ—অঁ—অঁ—

বিশ্রী কর্কশ আওয়াজ করে তক্ষক ডাকল—আমি চমকে উঠলুম। আমার ঘরের মধ্যেই ডাকছে। এতদিন তো ছিল না। আমি চলে যাওয়ার আগেই ঘরের দখল নিতে চাইছে নাকি? নিক—তাই নিক। আমার আর কোনো রাগ নেই কারো ওপর—আমি আর কোথাও কোনো দাবি রাখি না নিজের জন্যে।

কাল সকালেই এ ঘর থেকে চলে যাব।

আবার ছবি আসছে।

থিয়েটারটা হাতছাড়া হয়ে গেল। বেকার। ত্রিশ হাজার টাকা অতলে তলিয়ে গেছে। আরো যে কত গেছে, তার হিসেব করবারও আমার শক্তি নেই। একটা ক্লান্ত শূন্য মন নিয়ে বসেছিলুম—হঠাৎ উষার সঙ্গে খানিকটা বিশ্রী ঝগড়া হয়ে গেল।

বলেছিলুম, তুমি আমাকে আঁকড়ে পড়ে আছো কেন? নিজের পথ খুঁজে নাও।

—কোথায় যাব ?

—তোমার ভাবনা কী ? রূপালী থিয়েটার তো ডাকছেই। গেলেই পারো।

—ওই মাইনেতে যাব ? আমার একটা সম্মান আছে না ? আমার চাইতে যমুনাকে ওরা বেশি মাইনে দেবে—কোন লজ্জায় কাজ করব সেখানে ? আমি পারব না।

আমার মাথার ভেতর জ্বালা করে উঠল।

—কেন তোমাকে মাইনে দেবে যমুনার চাইতে বেশি ? এর এখন উঠ্‌তি বয়েস—কত গ্ল্যামার। তুমি পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে গেছ—হিরোয়িনের পার্টে পাব্‌লিক আর নিতে চায় না। ওরা যা দিচ্ছে, তাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট এখন।

উষা বরাবর চুপ করে থেকেছে, পারৎপক্ষে কোনোদিন তর্ক পর্যন্ত করেনি আমার সঙ্গে। আজ হঠাৎ বিশ্রীভাবে চিৎকার করে উঠল। ওর চোখ মুখের চেহারাই যেন বদলে গেল।

—আজ তো একথা বলবেই তুমি। আমার সর্বনাশ করে এখন তুমি সাধু সাজছ !

—উষা !

—বলবই তো, স্পষ্ট কথা বলব। পাঁচ বছর আগেও আমাকে অন্য থিয়েটারে সাধাসাধি করে নিয়ে যেতে চেয়েছে, কত টাকা দিতে চেয়েছে, সেদিন তুমি আমায় যেতে দাওনি। বলেছ, 'যে থিয়েটারে আমি নেই ; সেখানে উষা নামতে পারবে না।' আর আজ আমার বয়েস হয়েছে, বাজার নষ্ট হয়ে গেছে, এখন তুমি আমায় সোজা রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছ !

অসহ্য বিরক্তিতে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

—চুপ করো। সকাল বেলাতেই চেঁচিয়ো না পাগলের মতো। আমার মন-মেজাজ ভালো নেই।

—তোমার মন-মেজাজ ভালো নেই তো আমি কী করব? কী ভুলই না করেছি সারাজীবন! সেবার যখন উড়িষ্যার সেই রাজকুমার আমায় নিয়ে যেতে চাইল, তখন তাকে আমি দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলুম। কী জাদুই তুমি করেছিলে আমাকে! এখন ভাবছি, নিজের পায়ে কী ভাবেই আমি কুড়ুল মেরেছি—আজ আমি রাণীর হালে থাকতে পারতুম।

আমি তীব্র কটু গলায় কী খানিকটা কুৎসিত গাল দিচ্ছিলুম—হঠাৎ থামকে যেতে হল। দেখলুম, উষা ছুটে গিয়ে বিছানায় পড়েছে, বালিশে মুখ লুকিয়ে কেঁদে চলেছে পাগলের মতো। আর সেই মুহূর্তে অনুতাপের একটা উচ্ছ্বাস জেগে উঠল বুকের ভেতর। উষার কথা তো সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়। আমারই জন্যে—আমারই মতো ও আজ দেউলে হয়ে যাচ্ছে। কোন্ শনিগ্রহের দুর্বোধ খেয়ালে ও এমন করে জড়িয়ে গেল আমার জীবনে! আমি তো ডুবছিই, সেই সঙ্গে ও-ও ডুবছে!

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বেরিয়ে

কোথায় যাব? একবার মনে হল, বিনুর বাড়িতেই যাই। ও এখন কলকাতায় স্থায়ী অ্যাড্‌ভোকেট—বালীগঞ্জ বাড়ি করেছে। চিনুও এখানেই ব্যবসা করে। কাকীমা কলকাতায় বিনুর কাছে চলে এসেছেন—বোনগুলোর বিয়ে হয়ে গেছে, সবচেয়ে ছোট ভাই মৃণু—মৃণ্ময় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। দেশের বিষয়-সম্পত্তি কর্মচারীদেরই হাতে, তারাই যা ইচ্ছে দেখাশোনা করে, ওরা পূজোর ছুটিতে কখনো কখনো দেশে যায়।

যাব বিনুর কাছে? গিয়ে বলব, আবার হাজার বিশেক আমায় দে? সম্পত্তির কিছু অংশ কি আমার এখনো নেই? যদি না থাকে তবে ধারই দে, আমি ধীরে ধীরে শোধ করে দেব।

কিন্তু জানি, টাকা সে আর দেবে না। দু চার বছর আগেই বলেছিল, তোমার অংশ সবটাই কিন্তু বেচে দিলে নিমুদা—কিছু আর রইল না! এর মধ্যেই এমনভাবে সে পশার জমিয়েছে যে তার হাত থেকে আর একটি পয়সা বেরিয়ে আসবে—এখন এ স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর ধার? থিয়েটারের জন্যে টাকা দিয়ে ফেরৎ পাওয়ার আশা, না—অমন কাঁচা লোক বিনু নয়।

ট্রাম ডিপোর ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি কী করব, এমন সময় কে এসে আমায় প্রণাম করল।

আমি চমকে সরে গিয়ে বললুম, আপনি—

দেখি, সরস্বতী। মোতি যার নাম। গড়িয়ার বাগানবাড়িতে আজ তিন বছর ধরে যাকে ভরণ-পোষণ করছেন মুকুন্দবাবু।

সরস্বতী হেসে বললে, কালীমায়ের মন্দিরে গিয়েছিলুম দর্শন করতে। বেরিয়ে আসছি—দেখি তুমি দাঁড়িয়ে। মনে হল, তোমাকেও প্রণাম করি একটা।

এই তিন বছরে সরস্বতী মুকুন্দবাবুর সঙ্গে থিয়েটারে গেছে কয়েকবার, আমি ওদের বক্সে বসে থাকতে দেখেছি। তা ছাড়া আরো দুদিন গিয়েছিলুম গড়িয়ার বাগানবাড়িতে গানের জলসায়। সরস্বতীর সঙ্গে নমস্কার বিনিময় হয়েছে, কথা হয়েছে, টুকরো টুকরো।

—নমস্তে, ভালো আছেন? থিয়েটার ভালো চলছে? উষাজী কী তবিয়ৎ আচ্ছা তো? কিন্তু কাশীর সেই দিনগুলোর পরে সে তো কখনো আমাকে তুমি বলেনি।

আমি আশ্চর্য হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলুম ওর মুখের দিকে। না—কোনো ভুল নেই। সরস্বতীরও বয়েস বেড়েছে। মুখ গোল হয়েছে, সেই নাচের ছন্দে বাঁধা শরীর আর নেই, চর্বি জমেছে। আশ্চর্য—সব বদলায়।

একটু চুপ করে থেকে বললুম, হঠাৎ প্রণাম করলে কেন ?

সরস্বতী হাসল : রেইস্ আদমী—তাই।—তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, আজ কী বার বলো তো ?

—শনিবার।

—কী তারিখ ? অংরেজী তারিখটা বলো।

বললুম, সতেরোই আগস্ট। কিন্তু তারিখ জানতে চাও কেন ?

—এম্‌নি।—সরস্বতী আবার হাসস : ওই যে আমার মালিক আসছে—আমি যাই।

দেখলুম, একটা দোকান থেকে কী কতকগুলো কিনে আমার মোটরটার দিকে এগোচ্ছেন মুকুন্দবাবু।

সরস্বতী চলে গেল। পেছনে আমার মুখের ওপর রেখে গেল সন্তোস্নান আর চন্দনের গন্ধ। একবারের জন্য মনের ভেতর একটা আলোড়ন ফুটে উঠল আমার। এমনি একটা গন্ধ আমি এর আগেও পেয়েছিলুম। কিন্তু সে কবে ?

সেই সময় একটা ট্রাম এল মাঝখান দিয়ে—দাঁড়িয়ে পড়ল। সরস্বতী হারিয়ে গেল আমার চোখ থেকে।

মোমবাতির শেষ শিখা

॥ ১ ॥

একসঙ্গে চার পাঁচটা শেয়াল ডেকে উঠল ঠিক জানালার বাইরে। আমি চমকে জেগে উঠলুম।

ভেবেছিলুম কিছুতেই ঘুমোব না—অথচ ঠিক ঘুমিয়ে পড়েছি। কখন চোরের মতো ঘুম এসে মনের সজাগ পাহারাটাকে হটিয়ে দিয়েছে। নিজের ওপরেই রাগ হল। এ সেই পিতৃপুরুষদের চক্রান্ত। আর কিছু পারুক আর না-ই পারুক—অন্তত আজকের রাতটিতেও আমার মনের ওপর খানিকটা কুহক ছড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু পারবে না—কিছুতেই পারবে না ওরা।

কুঁজো থেকে গড়িয়ে আর এক গ্লাস জল খেলুম—পেটের মধ্যে কেমন একটা ধাক্কা লাগল। অনেকক্ষণ পরে এখন আবার লিভারের যন্ত্রণাটা টের পাচ্ছি। কিন্তু আজ রাতে আমি কাউকে গ্রাহ্য করব না। আজ নিজের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার বজায় রাখব আমি।

রাত ক'টা এখন? বোধ হয় তিনটের কাঁটা পেরিয়ে গেছে। উঠোনের ওপর যে মরা জ্যোৎস্নাটা ভাসছিল, সেটা যেন কখন মিলিয়ে গেছে—তরল অন্ধকার এসে জায়গা জুড়েছে। তার জানলার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের শূন্য মহলগুলো সারি সারি কবরের মতো দাঁড়িয়ে—কিংবা রাশি রাশি পোড়া তুবড়ির খোলা।

আমি জ্বালিয়েছি শেষ আলো। আমার হাতেই এর বিনাশ।

তা যদি না হত, যদি আমি সেদিনও জমিদারী দেখাশুনো করতুম, তা হলে এমন ভাবে সব ফুরিয়ে যেত না। বিনু নিজের সব গুটিয়ে

নিয়ে কলকাতায় কায়েম হয়ে বসত না, চিনু আর মৃণু নিজেদের মধ্যে মামলা করে ফতুর হয়ে যেত না। চিনুর ব্যবসা গেছে—এখন সে যেন কোন্ মারোয়াড়ী ফার্মে চাকরি করে। মৃণু সামান্য দুশো টাকা মাইনের প্রফেসারী নিয়ে বিহারে কোন্ এক শহরে পড়ে আছে।

সব বিক্রি হয়ে গেছে, এই পৈতৃক বাড়িটাও। শেষ কয়েকটা বছর আমি মুখ গুঁজিয়ে পড়েছিলুম—সামনের মাস থেকে কারা যেন এই বাড়ি দখল নেবে। আর কালই আমি চলে যাব।

চিনু আর মৃণু পঁচিশটা করে টাকা পাঠাত, তাদের অনুগ্রহের দান নিয়ে কোনোমতে আমার দিন কাটছিল। তাদের লিখে দিয়েছি আর টাকা পাঠানোর দরকার নেই। আমি চলে যাচ্ছি।

অথচ আমি যদি বারুদের স্তূপে আগুন না দিতুম, এমন করে সব যেত না। এইভাবে সব গিয়ে পড়ত না বিনুর খপ্পরের ভেতর। কিন্তু সে আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। যে দিন যাত্রার সময় তাকে রাজা সুরথের পার্ট দিইনি, সেই দিনই সে চ্যালেঞ্জ করেছিল আমাকে। আজ পুরো ক্ল্যাপটা সে-ই নিয়েছে, আর আমি পড়ে আছি কাটা সৈনিকের ভূমিকায়।

মোমবাতির আলোটা জ্বলে জ্বলে একেবারে নীচের দিকে চলে এসেছে। অত বড়ো বাতিটা কী ভাবেই যে পুড়ে গেল! শক্ত কাদা জমাট বাঁধা মোমের ভেতরে অসংখ্য পোকার শবদেহ। ওই আলোটার মতো আমিও জ্বললুম—পুড়লুম, পুড়িয়ে মারলুম।

অন্যায়? পাপ? না—কিছুমাত্রও নয়। জ্বলবার জ্বালাবারও অধিকার থাকা চাই—সকলের তা থাকে না। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ খানিকটা ভিজে কাপড়ের মতো, নিজেদের ছোটখাটো দুঃখ-সুখ নিয়ে দিনে দিনে পচে, গলে যায়—হারিয়ে যায়। শুধু দু-একজন আসে এই মোমবাতির মতোই—নিজে জ্বলে, অন্যকে

জ্বালায়, অগ্নিকাণ্ড ঘটায়। আর—আর—যাওয়ার আগে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে দিয়ে যায়।

আমি সেই ব্যতিক্রমদের একজন। কেন লজ্জা পাব? কেন বোধ করব অনুতাপ?

আমার শেষ অধ্যায়টার কথা ভাবছি।

উঠেছিলুম যত সহজে, তার চাইতেও সহজে নেমে গেলুম। নতুন করে থিয়েটার তৈরী করবার স্বপ্ন নিয়ে দরজায় দরজায় ঘুরেছি, কেউ আর আমায় তখন বিশ্বাস করে না। বাজারে গুড্ উইল আমার নষ্ট হয়ে গেছে। তারও পরে এসে গেছে সিনেমার নতুন যুগ। ছবি কথা বলতে শুরু করেছে। এদিকে থিয়েটার ভাঙছে হাত বদলাচ্ছে—আবার ভাঙছে, আবার জোড়া-তাড়া দিয়ে চলছে ওদিকে কিছুদিন। মানুষ পাগল হয়ে উঠেছে সিনেমার নেশায়।

চণ্ডীদাস ছবির গান বাংলা দেশকে মাতিয়ে দিচ্ছে:

"ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বঁধু ওইখানে থাকো
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখো—"

সে ছবি আমিও দেখেছিলুম। মাতাল করবার মতো। সঙ্গে সঙ্গে একটা আশঙ্কার ছায়া দুলে উঠছে বুকে—এ আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নাকি? থিয়েটারের আকাশে কালো হয়ে দুঃসময়ের মেঘ ঘনাচ্ছে—শুধু আমি? শিশির ভাদুড়ীর মতো সূর্যও তখন সেই মেঘের ছায়ায় ডুবে যাচ্ছেন। নির্মলেন্দু লাহিড়ী থই পাচ্ছেন না—আমি নির্মলকান্তি চৌধুরী আছি কোথায়? মান-অভিমান সব বিসর্জন দিয়েছি তার পরে। যে কোনো থিয়েটারে যে-কোনো টাকায় পার্ট পেলে বর্তে যাই। কিন্তু কোথাও টিঁকতে পারি না। অসম্ভব মাতাল হয়ে গেছি। আমাকে দিয়ে আর কাজ চলে না।

মনে পড়ে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছিলেন, সংযম ছাড়া শিল্পী বড়ো

হয় না। এই সোজা কথাটাই মনে রাখতে পারো না বলে তোমরা ফোটাবার আগেই ঝরতে শুরু করো।

ঝরবার পালা যখন আরম্ভ হয়েই গেছে তখন ও-সব কথা ভেবে আর কী হবে! দু-দশদিন পার্ট করি, পার্ট করি এ-দিকে ও-দিকে। আবার মাতলামোর জন্যে কাজ চলে যায়। সব রাতে ঘরে ফিরি না—নেশায় চুর হয়ে এর ওর বাড়িতে পড়ে থাকি। কালীঘাটের বাসা কবে ছেড়ে দিয়েছি, এখন দুখানা টিনের ঘর নিয়েছি ভবানীপুরে আদি গঙ্গার ধারে। বলতে গেলে ঊষাই এখন সংসার চালায়। সে যা হোক করে এখানে ওখানে পার্ট জোটায়, কখনো কখনো অ্যামেচারদের অভিনয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা পায়। আজ আমি তার গলগ্রহ।

সেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়েছি—উদ্দেশ্য নেই, লক্ষ্যও নেই। আমারি মতো কোনো ছন্নছাড়ার ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ সুখ-দুঃখের আলাপ করব, অক্ষম ঈর্ষায় নতুন কালের থিয়েটার সিনেমাকে গালাগালি করে খানিকটা জ্বালা মেটাব, এমনি একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা বোধ হয় মাথার ভেতরে ঘুরছিল। তবু কোন্‌দিকে যাব ঠিক করতে না পেরে দুদিকের গোটা পাঁচেক ট্রাম ছেড়ে দিয়েছি, বিরক্ত হয়ে বিড়ি ধরিয়েছি একটা, তখন কে যেন বললে, দাদা যে!

তাকিয়ে দেখি, সুভাষ।

এক সময়ে থিয়েটারে আসা-যাওয়া করত, রাজসভায় দরবারে সভাসদ হয়ে বসত, বড় জোর বলত, 'জো হুকুম জাঁহাপনা' কিংবা 'কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ।' তারপরে বহুদিন তাকে আর দেখিনি, থিয়েটারে অমন অনেক আসে অনেক যায়—কে আর কার কথা মনে রাখে!

দেখি, সুভাষের সে চেহারাই আর নেই। পরনে স্যুট

(এখনকার মতো অত বেশি স্যুটের চলন হয়নি তখন), গলার রঙিন টাই উড়ছে হাওয়ায়, এক হাতে ফাইল আর এক হাতে সিগারেট। কোনো ভালো সরকারী চাকরি পেয়েছে বলে মনে হল।

—কি হে, ব্যাপার কী? অফিসে যাচ্ছ নাকি?

—অফিস নয় দাদা, স্টুডিয়োতে যাচ্ছি। আমি আছি এখন সিনেমা লাইনে।

সিনেমা লাইনে! চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল গাঙ্গুলী মশায়ের 'তরুণী', কানে বেজে উঠল চণ্ডীদাসের গান 'ফিরে চলো আপন ঘরে'। এর আগে কথাহীন ছবি দেখেছি অনেক, দেখেছি দুর্গাদাসের 'দুর্গেশনন্দিনী', দেখেছি 'লাইট অফ্ এশিয়া', দেখেছি 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' পেশেন্স্ কুপারকে রোহিণীর ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করতে। ছবি চলছে, ফিরছে, হাসছে—থেকে থেকে একটা কার্ড ফুটে উঠছে: "এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর"—হলসুদ্ধ লোক সানন্দে সেটা আবৃত্তি করছে। বিলিতী ছবিও,দেখেছি—সবই এক রকম। কখনো মনে হয়নি, এরা কোনোদিন থিয়েটারের শত্রু হতে পারে, পর্দার ওপর নড়ে বেড়ানো গুটিকয়েক ছায়া ফুট্‌লাইটের আলোয় ঝল্‌কে ওঠা স্টেজের ইন্দ্রলোকের কাছাকাছিও যেতে পারে।

কিন্তু 'চণ্ডীদাস'—তরুণী' তো তা নয়। থিয়েটারের ভূমেন রায় কী মহিমা নিয়েই দেখা দিয়েছে 'তরুণী'তে—স্টেজের সমস্ত সুন্দরীদের ম্লান করে দিয়েছে জ্যোৎস্না গুপ্তার কোমল স্নিগ্ধতা, উমাশশীর গভীর চোখের বিদ্যুৎ ঝলক। থিয়েটারের বরণীয় অনেকেই চলেছেন সিনেমার দিকে, শিশির ভাদুড়ী দলবল নিয়ে ছবি করেছেন, মনোরঞ্জন নরেশ মিত্র ফিল্‌মে নামছেন—আমাদের ভবিষ্যৎ তবে কোন্‌দিকে?

এতগুলো কথা যেন একসঙ্গে মনের ওপর সিনেমার ছবির মতোই ফুটে উঠল। আর সুভাষ আমাকে চমকে দিয়ে বললে, তুমি তো এখনো কোনো ছবিতে নামোনি দাদা?

—না।

—স্টুডিয়ো দেখেছ?

—না।

—তবে চলো না আমার সঙ্গে—অবিশ্যি হাতে যদি কোনো কাজ না থাকে। নতুন বইয়ে শুটিং হচ্ছে, দেখে আসবে।

—শুটিং?

সুভাষ আবার হাসল: ভয় নেই, গুলি ছোড়া-ছুড়ির ব্যাপার নয়! ছবি তোলাকে শুটিং বলে—মানে, ক্যামেরা দিয়ে শুট্ করা হয় কি না? যাবে?

মন্দ কী! আমার তো এখন আর সময়ের অভাব নেই, অফুরন্ত অবকাশ। উষার বেদনাভরা নিঃশব্দ মুখ আর অভাবের জ্বালা, একটা নতুন জগতে পা দিয়ে অন্তত সেগুলো তো কিছুক্ষণের জন্যে ভুলতে পারব!

সুভাষের সঙ্গে টালীগঞ্জের ট্রামে চেপে বসলুম।

ডিপো থেকে নেমে, ধুলোভরা কদাকার রাস্তা দিয়ে, কাঁচা দুর্গন্ধ ড্রেন, এঁদো পুকুর, টিনের ছাউনি, পুরোনো বাড়ি আর ঝোপ-জঙ্গল পাশে রেখে স্টুডিয়োতে পৌঁছোনো গেল।

এই স্টুডিয়ো! মালগুদামের মতো টিনের ছাউনি, ভেতরে ভাপ্সা গুমোট, একরাশ চোখ ধাঁধানো অত্যন্ত বিরক্তিকর জোরালো আলো, ধুলো আর রঙের গন্ধ, চারদিকে অসংখ্য তার! যেন একটা পোড়ো কারখানার মধ্যে ঢুকেছি। এই আনন্দহীন, শ্রীহীন, যান্ত্রিক পরিবেশে 'চণ্ডীদাস' 'তরুণী' গড়ে ওঠে—শিশির ভাদুড়ী 'সীতা' তৈরী করেন। আশ্চর্য! এর মধ্যে কেমন করে

শিল্পীর মন মুক্তি পায়, কোথা থেকে আসে আবেগ, কী করে গড়ে ওঠে সেই অপরূপ নাটকীয় মুহূর্তটি : যার ছোঁয়া লেগে দর্শকের হৃৎপিণ্ডে বিদ্যুৎ বইতে থাকে ?

স্টুডিয়ো এত কুৎসিত এ আমি ভাবতেও পারিনি।

পুরোনো দু'একজন অভিনেতাকে দেখলুম, একজন হাসল, একজন এসে পায়ের ধুলো নিলে।

—নির্মলদা এখানে ?

—দেখতে এলুম।

—নামবে নাকি ? নেমে পড়ো, নেমে পড়ো তা হলে। তোমরা হলে পুরোনো আগুন—এখনো দপ করে জ্বলে উঠতে পারো।

ঠাট্টা করল নাকি ? জানি না। আমি একটা টিনের চেয়ারে বসে বসে শুটিং দেখতে লাগলুম।

এক টুকরো সাজানো সেটে গোটা কয়েক কাটা কাটা কথা—এর নাম শুটিং। কোথায় নাটক—কোথায় দৃশ্যে দৃশ্যে জমে-ওঠা ক্লাইম্যাক্স্—কোথায় সেই পরম মুহূর্ত যখন অভিনেতা নিজেকে তীব্রতম আবেগের ঘূর্ণির ভেতরে হারিয়ে দিতে পারে। এ সব মেকি। নকল নাটক, নকল আবেগ, ছেলে-ভুলোনো মালা-গাঁথা ছবি। শিশির ভাদুড়ী পর্যন্ত এর মায়া কাটাতে পারলেন না ? বাংলা দেশের সেরা শিল্পীদের কাছে পর্দার ওপর কিছুক্ষণ নকল নাটকের মধ্যে নড়ে-চড়ে বেড়ানোর আকর্ষণটা এতই কি বড়ো হয়ে উঠল।

ডিরেকটারের সঙ্গে মুখচেনা ছিল, কয়েকটা নীরব ছবি তুলেছেন এর আগে। এসে বললেন, কেমন লাগল ?

বললুম, মন্দ কী।

—নামবেন নাকি একবার ? আমার একটা পার্টের জন্যে লোক দরকার ছিল। আপনি হলে ভালোই হয়।

কী পার্ট ?

—মানে বাড়ির একজন বুড়ো চাকর—আফিং খায় আর ঝিমোয়, কিন্তু অত্যন্ত প্রভুভক্ত। নায়িকা যখন আত্মহত্যা করতে গঙ্গার দিকে যাচ্ছে, তখন সে-ই এগিয়ে এসে তাকে বাঁচায়। অল্প পার্ট, কিন্তু খুব সক্‌ট। ভালো অ্যাক্টার* না হলে জমাতে পারবে না। আপনি এলে আমার আর প্রব্‌লেম থাকে না।

আমি চুপ করে রইলুম।

ডিরেকটার আবার বললেন, তিনদিনের কাজ—পার ডে দশ টাকা করে। কী, করবেন নাকি ?

বললুম, না।

—কেন, টাকা কম হল ভাবছেন ? আমরা ছোট পার্টের জন্যে তো কোনো টাকাই দিই না, শুধু আপনি বলেই—

—টাকার জন্যে নয়। আপনাদের ছবির অভিনয়ের সঙ্গে আমি মানাতে পারব না।

—কেন পারবেন না ?—ডিরেকটার আমার দিকে একটা সিগারেট বাড়ালেন, সেটা না নিয়ে আমি বিড়ি ধরালুম। ডিরেকটার বলে চললেন, স্টেজের সবাই-ই তো এই দিকেই আসতে চাইছেন এখন। আপনার আপত্তি কেন ?

—হয়তো আমি একটু আলাদা বলে। মাপ করবেন, আমি শুধু শুটিং দেখতেই এসেছিলুম।

—আপনি বোধ হয় ভুল করছেন নির্মলবাবু। পরে অনুতাপ করবেন।

বললুম, অনুতাপ আমি কখনো করি না। ও অভ্যাসটা কোনোদিন আমার নেই।

টালীগঞ্জের ডিপো থেকে আবার ট্রামে করে ফিরে আসতে আসতে নিজের মনকেই প্রশ্ন করছিলুম আমি। কেন বায়োস্কোপে

নামবার প্রস্তাবটা অমন সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করলুম?—নতুন ধরনের অভিনয়ের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারব না, এই কি কারণ, এই কি যুক্তি? না—তা তো নয়। এত নাটকে এত অভিনয় করেছি, আর এই মেকির জগতে মানুষকে একটুখানি ভোলাতে পারব না—তাও কি হয়? আমি নির্মলকান্তি চৌধুরী, নিজের শক্তির ওপর পুরো বিশ্বাস আমার আছে। আসল কারণ সেখানে নয়। আজ কি আমি অভিনয়ের জগতে এমন পংক্তিতেই চলে এসেছি—যেখানে পুরোনো বুড়ো চাকরের ভূমিকা ছাড়া আমাকে আর মানায় না? রাজকুমার, নায়ক, যুবকের জগৎ থেকে আমি কি একেবারেই বাতিল?

সেই অপমানটাই বিঁধছে। থিয়েটারে 'মেক-আপের' জোরে আরো কিছুদিন হয়তো চালাতে পারি—যদিও এখন আমার হাতে বিশেষ কিছু কাজ নেই—কিন্তু বায়োস্কোপের ক্যামেরার সামনে তো কোনো ফাঁকি চলবে না। আমার সমস্ত কাঙালপনা, আমার অস্বাস্থ্য, আমার রেখাজর্জর ক্লান্ত মুখ সেখানে নিষ্ঠুর নগ্নতায় ফুটে উঠবে।

খুব বয়েস হয়েছে আমার? না—তা নয়। কিন্তু নিজের ওপর অত্যাচারে আমি বুড়িয়ে গেছি। আমার চোখের কোণে ঘন কালো রঙ, আমার মুখে অকাল বার্ধক্যের ছায়া। রূপের জগতে আমি আর কেউ নই—আমার সব প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

তা হলে ঊষারাণীরও একই দশা? বাড়ির বুড়ী ঝি কিংবা বিধবা পিসীমার ভূমিকা ছাড়া সিনেমায় তাকে আর মানায় না?

আমি চোখ বুজে বসে রইলুম। ট্রামের গতির সঙ্গে সঙ্গে মনে হল—আমি আর মাটি দিয়ে চলছি না। আকাশে একটা নক্ষত্রের মতো জ্বলছিলুম, সেখান থেকে মহাশূন্যের মধ্যে ছিটকে পড়েছি। অতল কালো রাশি রাশি শূন্যতার মধ্য দিয়ে পড়েছি—পড়েই চলেছি। আমার বুকের ভেতরে যে-আগুন জ্বলছিল, হু-হু করা বাতাস

যেন হিংস্র নিষ্ঠুর আক্রোশে ফুঁ দিয়ে দিয়ে তাকে নিবিয়ে দিচ্ছে। এরপরে কখন ছাই হয়ে কোন্ সমুদ্রে মিশে যাব।

একটা? না—একটা নয়—ছুটো তারা।

তবু সেই রাত্রে একবার জেগে উঠতে চেয়েছিলুম। শেষবার।

আমার টিনের ঘরের জানলা দিয়ে দেখছিলুম, ভাঁটার টানে আদি গঙ্গার পঙ্কিল জল ছুর্গন্ধ ছড়িয়ে বয়ে চলেছে, তার ওপর ছুধার থেকে টুকরো টুকরো আলো ঝলকাচ্ছে—যেন এঁকেবেঁকে একটা প্রকাণ্ড চন্দ্রবোড়া সাপ পালিয়ে যাচ্ছে দ্রুত বেগে। আলিপুর জেলখানার ওপরে একটা মস্ত বড়ো আলো চোখ পাকিয়ে আছে আমার দিকে। একটা নিষ্প্রাণ শিরীষগাছের লক্ষ্মীছাড়া ছায়া ছুলছে রাস্তার ওপর—কুকুর ডাকছে থেকে থেকে আর অনেক দূরে ঢোল-খঞ্জনি বাজিয়ে সন্ধ্যেবেলায় যে হিন্দুস্থানীরা গান ধরেছিল, ক্লান্তিতে তাদের গলা বুজে আসতে চাইছে।

বুকের ভেতর সারাদিন যন্ত্রণাটা চলছিল, আমি শুতে পারিনি, ঘুমুতে পারিনি। বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই, শুধু একটা লণ্ঠন বিমর্ষ শিখায় জ্বলছিল। সেই আলোয় আমি দেখলুম, আমার অপরাধের ভার বয়ে ক্লান্ত অবসন্ন ঊষা মড়ার মতো ঘুমুচ্ছে।

এই সেই ঊষা! কত রাত্রিতে স্টেজের উজ্জ্বল আলোগুলোকে মলিন করে দিয়ে রাণীর মতো রূপের ছটা ছড়িয়ে দর্শকদের মাতাল করে দিয়েছে! এ সেই?

আমি আর সইতে পারলুম না। ঊষাকে একটা ধাক্কা দিলুম।

জড়ানো গলায় ঊষা বললে, কী হল?

—উঠে এসো।

—কেন?

—এসো—ছুজনে মিলে পার্ট করব একবার।

—কিসের পার্ট?—ঊষা চোখ মেলল।

—আমি অর্জুন, তুমি কৃষ্ণা। এসো।

—কী ছেলেমানুষি হচ্ছে? ঘুমোও।—উষা পাশ ফিরল।

—ছেলেমানুষী নয় উষা—বড্ড দরকার। ওঠো একবার উঠে এসো—

বিরক্ত গলায় উষা বললে, ঘুমোও—ঘুমোও, আমাকে আর জ্বালিয়ো না। এত রাত্রে এখন আর মাতলামো ভালো লাগছে না।

মাতলামো? মদ আমি খেয়েছি বটে, কিন্তু আজ একবিন্দুও মাতাল হইনি। কিন্তু উষা সে কথা বুঝল না। একটু পরেই সে আবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল—কৃষ্ণার পার্ট কবে করেছিল আজ সে কথাই হয়তো ভুলে গেছে।

কিন্তু আমি ঘুমুতে পারলুম না। আগুন-জ্বলা তপ্ত বুকটাকে জানলার শক্ত গরাদেতে চেপে ধরে বাইরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, আমার চোখের সামনে আদি গঙ্গার দুর্গন্ধ ঘোলা জল জোয়ারের টানে একটা চন্দ্রবোড়া সাপের মতো দ্রুত এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলল।

এ-ই মৃত্যু। বেঁচে থেকেও মরণ কাকে বলে, এইবার সেই সত্যকে আমি বুঝতে পারছি।

কিছুদিন হাতে কোনো কাজ ছিল না। সম্পূর্ণ বেকার। উষা একটা দলের সঙ্গে মফঃস্বলে গেছে থিয়েটার করতে। আমাকে সঙ্গে নেবার জন্যে তদ্বির করেছিল, কিন্তু থিয়েটারের কর্তারা বলে দিয়েছেন, তাঁরা অভিনেতা চান, মাতাল চান না।

উষা যেতে চায়নি আমাকে ছেড়ে। খুব কেঁদেছিল।

—তোমাকে নিয়েই যত ভাবনা আমার। আমি চলে গেলে কী করে বসবে কে জানে!

বলেছিলুম, কিছু ভেবো না, আমি ঠিক থাকব।

উষা বলেছিল, ফিরতে হয়তো আমার দেড় মাস-দুমাস দেরী হবে। নোয়াখালি, চিটাগাং, কুমিল্লা, ঢাকা, বরিশাল হয়ে তারপর ফিরব। কিছু টাকা রেখে যাচ্ছি, যখন যেমন পারি পাঠাব। দোহাই তোমার, ছাইপাঁশ বেশি খেয়ো না। আর যা খাও বাড়িতে বসেই খেয়ো। তোমার পায়ে পড়ি, এদিক-ওদিক যেয়ো না।

—না-না, আমি ঠিক আছি।

—আমার গা ছুঁয়ে শপথ করো তুমি ভালো থাকবে?

—থাকব।

উষা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু না করেও উপায় ছিল না। অনেক টাকা পাবে। আমাদের সুদিন চলে যাওয়ার পর এত টাকার মুখ সে একসঙ্গে আর দেখেনি।

কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা রাখতে পারিনি।

তিন চার দিন সংযত হয়ে থাকতে চেয়েছিলুম, তারপর এক সন্ধ্যায় কোনো রাশই আর আমার মনকে বাঁধতে পারল না। ঘুরতে ঘুরতে হাজির হলুম এক দিশী মদের দোকানে।

প্রথমটায় ইচ্ছে ছিল একটু গলা ভিজিয়েই চলে যাব। কিন্তু একবার রক্তে সেই শয়তান জাগল, তখন তাকে কে আর ঠেকায়? কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজের বাইরে চলে গেলুম।

তখন সেই আলাপটা আমার কানে এল।

—যাবি আজ থিয়েটারে?

আর একজন বললে, দ্যুৎ—কী আছে থিয়েটারে? সিনেমায় যাই।

আমার নেশা-ধরা মগজে হঠাৎ যেন আগুন ফুটে উঠল। হঠাৎ মনে হল, আজ আমার যত দুর্গতি—যা কিছু বিড়ম্বনা, তার জন্যে এই লোকটাই দায়ী—এরাই আমাদের বাঁচবার পথ বন্ধ করে দিচ্ছে।

লোকটার দিকে আরক্ত-দৃষ্টি ফেলে বললুম, কী বললেন আপনি থিয়েটার সম্বন্ধে ?

সে-ও তখন মাতাল। ভ্রূকুটি করে বললে, বললুম থিয়েটার অতি নচ্ছার জিনিস। কোন ভদ্রলোক দেখে না।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম, কটা ভদ্রলোক দেখেছিস তুই ? থিয়েটারের তুই কি জানিস ?

সেও উঠে দাঁড়ালো তৎক্ষণাৎ। ঠাস্ করে আমার গালে একটা চড় বসিয়ে বললে, চুপ কর্, শালা মাতাল। বেশি বকবক করবি তো এই বোতলের ঘায়ে মাথা ভেঙে দেব এখুনি।

বোতলটা সে তুলতে যাচ্ছিল, আমিই আমারটা তুলে নিলুম তার আগে। তারপর—

বোতল ভাঙল বোমার মতো আওয়াজ করে। বিকৃত চিৎকার তুলে মাটিতে পড়ল লোকটা, খানিকটা ছল্‌কানো মদ আর ভাঙা কাচের গোটা কয়েক টুকরো ছিটকে এসে আমার মুখে লাগল।

চারদিকে চিৎকার উঠল : খুন—খুন।—আমিও যেন একবার ভাঙা গলায় বললুম, খুন। তারপর কে যেন সজোরে আমার বাঁ-কানের ঠিক ওপরটায় গেলাস দিয়ে ঘা মারল। আমি মুখ থুবড়ে পড়লুম—পৃথিবী লুপ্ত হল।

ছ'মাস পরে বেরুলুম জেল থেকে। চরম হয়ে গেছে তখন।

আমি নির্মলকান্তি চৌধুরী। ব্রাহ্মণের সন্তান। বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে গড়া এক জমিদারবংশে আমার জন্ম হয়েছিল ; আজ লজ্জা-গ্লানির শেষ সীমায় পৌঁছে পূর্বপুরুষের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছি।

আমি থিয়েটারকে ভালোবেসেছিলুম। শিল্পী হতে চেয়েছিলুম। কিন্তু এই কথাটা ভাবিনি যে শিল্পীটাও সাধনা। জানতুম না,

বীরাচার তন্ত্রে সব প্রলোভনের উপকরণই আছে, কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পারাই সিদ্ধি। যখন বুঝেছি, তখন সাধনার আসন ছেড়ে আমি বেরিয়ে এসেছি গণ্ডীর বাইরে। তারপর আমাকে ঘিরে ঘিরে ডাকিনীর উৎসব—কবন্ধের নৃত্য ; ব্রতভ্রষ্ট সাধকের অপঘাত।

অনুতাপ ? না—অনুতাপ আমার নেই ! পাপ আমি করিনি, সত্য আমারও ছিল। দুঃখ—হ্যাঁ, দুঃখ—আছে। আমি প্রমাণ করতে পারলুম না কত বড়ো শক্তি নিয়ে এসেছিলুম ; দেখাতে পারলুম না —একদিন নিজের জোরে শিশিরকুমারের কাছাকাছি জায়গা করে নেবার যোগ্যতা আমারও ছিল।

কিন্তু সে কথা আর নয়। যা হতে পেরেছি তা-ই আমার পরিচয়, যা হতে পারিনি—সে হয়তো আরো সত্য, কিন্তু আমি ছাড়া সে কথা আর কেউ জানবে না।

আঃ, লিভারটা আবার যন্ত্রণায় মোচড় দিচ্ছে, সারা শরীর ঝিমঝিম করে উঠছে। তবু ওই যন্ত্রণাকে আমি ভুলব। এই বাড়িতে শেষ মুহূর্তটি কাটানো পর্যন্ত কোনো দুর্বলতাকে এতটুকুও আমি প্রশ্রয় দেব না। কাল যখন পৃথিবীর পথে বেরিয়েই পড়ব, তখন কোনো ভাবনা আর রাখি না। যা হাওয়ার তাই হোক।

জেল থেকে বেরিয়ে আমি আর উষার কাছে যাইনি। আমি বুঝতে পেরেছিলুম—অনেক দেরী হয়ে গেছে, তবু এবার মুক্তি দেওয়া উচিত। নিজেকে আর আমি বিশ্বাস করি না। এর পরে হয়তো এক দিন ওকে খুন করে—ওর সামান্য যা গয়না আছে তাই নিয়ে, আমি পালাতে চেষ্টা করব। একবার যখন মদের ঝোঁকে মানুষের মাথা ভাঙতে পেরেছি, তখন আমি সব পারি। আর কিছুই এর পরে আমার বাধবে না।

টালিগঞ্জে আমি গেলুম না। তার বদলে চলে এলুম রামবাগানে।

দরজা খুলে দিয়ে মেয়েটি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল আমার দিকে। বললে, নির্মলদা!

আমি বললুম, অলি তোর ঘরে আমায় ক'দিন থাকতে দিবি? আমার কেউ নেই। দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিবি, আর রোজ একটা করে বারো আনার বোতল। পারবি না ভাই?

অলি—অলকার চোখ দিয়ে জল পড়ল। এই মেয়েটিকে আমিই একদিন আবিষ্কার করেছিলুম, উদ্ধার করেছিলুম সখীদলের উপেক্ষার দীনতা থেকে। আজ তার অনেক নাম হয়েছে, একটা বড় থিয়েটারের নায়িকা সে।

অলি বললে, এসো দাদা, আমার ঘরে। আমার যদি দু'মুঠো জোটে, তোমারও জুটবে।

একটা বছর কাটিয়েছি আমি অলির আশ্রয়ে। আমার নিজের বোন ছিল না—বোনের স্নেহ কোনোদিন আমি পাইনি। আজ অলির মধ্যে যেন তা নতুন করে ফিরে পেলুম।

বলতুম কেন আমি এ ভাবে তোর গলগ্রহ হয়ে থাকি দিদি? আমি চলে যাই।

—কোথায় যাবে?

—জানি না। পৃথিবীর যেখানে হোক।

—তুমি যেতে চাইলেই আমি যেতে দেব?—অলির চোখ আবার জলে ভরে উঠত: আমার আজ যা কিছু সবই তোমার জন্যে। এই শরীর নিয়ে তুমি যদি বাড়ির বাইরে পা দাও, মাথা খুঁড়ে আমি রক্তগঙ্গা করব।

প্রায় এক বছরের মধ্যেও সে কোনোদিন আমাকে উষার কথা জিজ্ঞাসা করেনি। কেন করেনি আমি জানি। হয়তো ভেবেছে,

উষা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে—একটা ব্যাধিগ্রস্ত মাতালকে কে সহ্য করবে আজীবন?

আর আমি প্রাণপণে ভুলে থাকতে চেয়েছি উষাকে। আজ আর এ সত্য আমার নিজের কাছে গোপন নেই যে আমিই উষারাণীর সমস্ত সম্ভবনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছি। আমাকে ভালবাসতে গিয়েই সে দেউলে হয়ে গেছে। আমি তার সব নিয়েছি, বিনিময়ে এতটুকুও ফিরিয়ে দিতে পারিনি। আজ যদি অনেক দেরীই হয়ে থাকে তবুও সে মুক্তি পাক, তবুও সে নতুন করে জীবনের শেষ ক'টা দিন অন্তত বেঁচে ওঠবার সুযোগ নিক।

কিন্তু উষা বাঁচল না।

সেদিন থিয়েটার থেকে ফিরে অলি কিছুক্ষণ বিষণ্ণ ভাবে আমার বিছানার পাশে বসে রইল। আমি তখনো জেগেই ছিলুম, একটা সিনেমা পত্রিকা পড়বার চেষ্টা করেছিলুম। আমাদের দিন আর নেই —এখন শেষ রাত পর্যন্ত থিয়েটার চলে না, বারোটার মধ্যেই অলি ফিরে আসে।

আমি বললুম, কিছু বলবি অলি।

অলি তক্ষুণি জবাব দিলে না। একটু ইতস্ততঃ করে বললে, উষাদির কোন খবর জানো নির্মলদা?

আমি চমকে উঠলুম, কেন কী হয়েছে?

—উষাদি আর বাঁচবে না।

মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকে গেল। উঠে বসে আমি অলির হাত চেপে ধরলুম।

—অলি, কী হয়েছে উষার? কোথায় সে?

থিয়েটারে যা শুনে এসেছে, তাই আমাকে জানালো অলি। আজ চারমাস ধরে টি-বি-তে ভুগছে উষা। হাতে একটি পয়সা নেই তার। যক্ষ্মা হাসপাতালে গিয়েছিল, ফ্রী-বেডে কোনো জায়গা

পায়নি। সেখান থেকে বলে দিয়েছে, এখন কিছুই করবার নেই—ডাক্তারী শাস্ত্রের বাইরে চলে গেছে সে।

—কোথায় আছে?

—কোথায় আর থাকবে? সোনাগাছিতে তার মাসী এনে কাছে রেখেছে। ওষুধ নেই, খেতে পায় না—তিলে তিলে মরে যাচ্ছে। অথচ কী দিনই ছিল উষাদির। এত রূপ, এত নাম, এত ভালো অভিনয়, আর আজ—অলির গলা ভরে উঠল মমতায় আর বেদনায়।

আমি তখন নেমে পড়েছি বিছানা থেকে। পা বাড়িয়েছি দরজার দিকে।

অলি চমকে বললে, কোথায় চললে?

—উষার কাছে।

আমি যাওয়ার পরে সাত দিনের বেশি বাঁচেনি উষা। শুধু মরবার আগে যখন ওর মাথাটা কোলে তুলে নিয়েছিলুম, শেষ রক্তের ঝলকটা মুছে দিয়েছিলুম কোঁচার কাপড় দিয়ে, তখন উষা ভারী তৃপ্তির হাসি হেসেছিল।

—ভেবেছিলুম, মরবার আগে তোমার সঙ্গে বুঝি আর দেখা হবে না। কিন্তু কোনো সাধ আমার বাকী রইল না।

আমার নাটকের শেষ দৃশ্যে যবনিকা পড়ল। একটুকুই অবশিষ্ট ছিল বুঝি। ঠিক এমনি একটা মরণ না হলে দর্শকের চোখে জল আসে না। কিন্তু আমার নাটকে আমার চোখে জল এল না—তালি দেবার জন্যেও তুলতে পারলুম না হাতদুটোকে। শুধু মনে হতে লাগল জীবনের চব্বিশটা বছর ধরে কী ব্যর্থতার মধ্যেই উষাকে আমি তলিয়ে দিলুম।

ওকে পুড়িয়ে শ্মশান থেকে আমি আর ফিরতে পারলুম না অলির কাছে।

রথতলা ঘাটের ধারে গঙ্গার পাশে এসে বসলুম চুপচাপ। সামনে

দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গার ঘোলা স্রোত। সেই স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনের ইতিহাসটাও যেন দেখতে পাচ্ছিলুম আমি। শেষ অভিনয়ের পরে এখন আমি আর কী করব—কী আর আমার করবার আছে?

এমন সময় কে আমার কাঁধে হাত রাখল। তাকিয়ে দেখলুম চিনু।

বিনুর ভাই হয়েও ওরা বিনুকে চিনে নিয়েছে। হয়তো আমার জন্যে একটা ক্ষীণ মমতাও হয়তো জেগেছে ওদের।

চিনু বললে, বড়দা!

আমি ঘোলাটে চোখে চেয়ে রইলুম। কথা বলতে পারলুম না।

—কেন পাগলের মতো এমন করে পথে পথে ঘুরছ বড়দা?

জবাব দিলুম, আমার কোনো ঠাঁই নেই কোথাও।

চিনু নিঃশ্বাস ফেলল। ধীরে ধীরে বললে, তা হলে দেশে গিয়ে থাকো না কিছুদিন। বাড়িটা তো খালিই পড়ে আছে। আমরা যা পারি মাসে মাসে তোমায় পাঠাব।

আমি উঠে দাঁড়ালুম। দেশেই যাব। প্রথম অভিনয়ের যবনিকা যেখানে উঠেছিল, শেষ যবনিকাও সেইখানেই পড়ুক। আমার পক্ষে সব জায়গাই এখন সমান। দেশ, কলকাতা, বাংলা দেশ, সারা ভারতবর্ষ—সব আমার কাছে এখন একাকার।

চিনু বললে, আমার সঙ্গে গাড়ি আছে, চলো।

...ক্ষীণ হতে হতে এইবারে মোমবাতিটা নিবে গেল। পোড়া। পলতের ধোঁয়ার গন্ধে ভরে উঠল ঘর।

বাইরের অন্ধকার শাদা হয়ে এসেছে। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস টের পাচ্ছি। আমার যাওয়ার সময় হয়ে এল।

চেয়ার থেকে অসাড় আড়ষ্ট শরীরটা টেনে তুলে আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম। পোড়া তুবড়ির খোলাগুলোকে শেষবারের মতো দেখে যাই একবার।

॥ ২ ॥

কী আর নেব ? কী আর নেবার আছে ?

ওই ছোট সুট্‌কেস্‌টা। দু'একটা টুকিটাকি জিনিস। আমি জানি, আমার সময় শেষ হয়ে গেছে, অপ্রয়োজনের বোঝা টেনে আর শেষের দিনগুলোকে ভারী করতে চাই না। এখন যতখানি পারি নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে পথ চলা। আর চলতে চলতে ফুরিয়ে যাওয়া।

কানাইয়ের মা এল। যাবার আগে ওই গুছিয়ে দেবে জিনিসপত্র, ওরই কাছ শেষ মমতার পাথেয়টুকু কুড়িয়ে নিয়ে যাব।

কানাইয়ের মা এসে বললে, বাবু, এই চিঠিটা কাল সাঁজ-বেলায় ডাকপিয়ন দিয়ে গিয়েছিল। আনতে ভুলে গিয়েছিনু।

সকালের প্রথম আলো পড়েছে। সেই আলোয় দেখলুম, খামখানা। চিনু কিংবা মৃণুর হাতের লেখা নয়। সম্পূর্ণ অচেনা।

কে লিখল ? এ বাড়ি থেকে বিদায় নেবার আগে এমন ভাবে আমাকে স্মরণ করল কে ? খামটা খুলে ফেললুম।

চিঠিখানা এই :

মেরী রাজা,

আমি বাংলা আজকাল বুঝতে পারি, কিন্তু লিখতে পড়তে পারি না। তাই আর একজনকে দিয়ে চিঠিটা লেখালুম। আশা করি তুমি রাগ করবে না।

আমাকে চিনতে পারছ কি ? আমি সরস্বতী বাঈ। এখন আর মোতি নই। আজ ছ'মাস হল মুকুন্দবাবু মারা গেছেন। দশটা বছর ওই নামে তিনি আমায় বেঁধে দিয়েছিলেন, আজ ও নামটার হাত থেকে আমি ছুটি পেয়েছি।